রঙিন চশমা
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জীবনটা ছিল অসাধারণ। অনেকদিন থেকেই ভাবছি আমি সেই সময়টুকুর কথা লিখে রাখি, শুরু করে আবিষ্কার করলাম কাজটা সহজ নয়। গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ভুলে বসে আছি অথচ একেবারে তুচ্ছ কোনো ঘটনার খুঁটিনাটি সবকিছু মনে আছে। লিখতে গিয়েও দেখি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই; জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলোই ঘুরেফিরে উঠে এসেছে।

তখন মাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার বয়স কম, চোখে তখন একধরনের রঙিন চশমা। সেই রঙিন চশমার এমনই জাদু যে তুচ্ছ সাধারণ ঘটনাকেই অসাধারণ মনে হয়—আসলে আমার তো কিছু করার নেই!

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট, ১২ ডিসেম্বর ২০০৬

স্বাধীনতা

আমার মায়ের চেহারা তখন ডাইনি বুড়ির মতো, কোটরাগত চোখ জ্বলজ্বল করছে, আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, "তুই পারবি?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "পারব।"

আমার মা আমাকে যে কাজটি করতে বলেছেন সেটি খুব সহজ কাজ ছিল না—বাবার কবর খুঁড়ে তার দেহাবশেষ বের করা, সারা পৃথিবীতে খুব বেশি মানুষকে এই কাজটি করতে হয়েছে বলে মনে হয় না। একাত্তরে এই দেশে পাকিস্তান মিলিটারি লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরেছে; এদের ভেতরে আমার বাবাও একজন। মৃতদেহটি নিজের চোখে দেখেন নি বলে আমার মা কখনোই ঘটনাটা বিশ্বাস করেন নি। যারা নদী থেকে তুলে বাবার দেহটিকে নদীতীরে কবর দিয়েছে তারা এসে নিজের মুখে বলার পরেও আমার মা সেটা বিশ্বাস করেন নি। সমস্ত যুক্তিতর্ক পাশ কাটিয়ে আমার মা বিশ্বাস করতেন বাবা বেঁচে আছেন, দেশ স্বাধীন হলে বাবা ফিরে আসবেন।

দেশ স্বাধীন হয়েছে বাবা ফিরে আসেন নি। বাবার মৃত্যুকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই, তখনো মা শেষ চেষ্টা করলেন। আমাকে বললেন কবরটা খুঁড়ে দেখতে সত্যি সত্যি সেখানে বাবার দেহ আছে কি নেই।

তখন জানুয়ারির শেষ কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিক, অনেকদিন পর ইউনিভার্সিটি খুলেছে। ছেলেমেয়েরা হইচই করে ক্লাস করছে, স্বাধীন দেশে

প্রথমবার ক্লাসে যাবার আনন্দটাই অন্যরকম। আমি ক্লাসে যেতে পারছি না, মাকে নিয়ে পিরোজপুরে যাচ্ছি। সেখানে একটি নদীতীরে আমার বাবার কবর খুঁড়ে তার দেহাবশেষ বের করতে হবে। কাজটা কীভাবে করব চিন্তা করেই আমার বিচলিত হবার কথা ছিল, কিন্তু আমি আসলে সেটা নিয়ে এতটুকু বিচলিত ছিলাম না, এর চাইতেও অনেক কঠিন একটা কাজ আমার তখনো করা বাকি ছিল।

আমার সবচেয়ে ছোট বোন কথা বলতে পারে না, তাকে জন্ম দেবার সময় আমার মায়ের জার্মান মিজেলস হয়েছিল বলে সে এই অক্ষমতাটুকু নিয়ে জন্মেছিল। কথা বলতে পারে না বা কথা শুনে বুঝতে পারে না বলে একাত্তরের এই পুরো সময়টুকু তার কাছে ছিল একধরনের বিভীষিকার মতো। আমার বাবাকে যে পাকিস্তান মিলিটারি মেরে ফেলেছে এটাও সে তখনো জানে না। আমার তাকে এই কথাটি বলতে হবে।

সৃষ্টিকর্তা আমাকে দিয়ে অনেক নিষ্ঠুর কাজ করিয়েছেন, আমার বাবার মৃত্যু সংবাদটি আমি গিয়ে আমার মাকে দিয়েছিলাম। আমার মুখ থেকে সেই কথাটি শুনে একমুহূর্তে আমার মায়ের চোখে যে শূন্যদৃষ্টির সৃষ্টি হয়েছিল আমি সেটি কখনো ভুলতে পারি নি। এই জন্মে সেটি আমি ভুলতে পারব না। এখন আমার ছোট অবুঝ বোনটিকে সেই একই কথাটি বলতে হবে এবং তারপর সে যখন উদভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকাবে আমি সেটাও ভুলতে পারব না।

আমার ছোট বোনটি কমিক পড়তে খুব পছন্দ করত, আমি নিউমার্কেটের সামনে থেকে কয়েকটা পুরোনো কমিক কিনে সাথে নিয়েছি। মা আর ছোট বোনকে নিয়ে সদরঘাটের ভিড়ের ভেতর দিয়ে লঞ্চঘাটে যাচ্ছি। আমাদের সাথে একজন দীর্ঘদিনের বিশ্বাসী মানুষ, তার নাম আমানুল্লাহ—আমার জীবনে তার মতো চমকপ্রদ জীবনের মানুষ আমি একটিও দেখি নি, যদি সত্যিকারের সাহিত্যিক হতাম তাহলে নিশ্চিতভাবেই তাকে নিয়ে আমি একটা বই লিখতাম। সত্যিকারের সাহিত্যিক না বলে বানিয়ে বানিয়ে মহাজাগতিক আগন্তুকের গল্প লিখতে হয়।

সদরঘাটের সেই ভিড়ে আমি আমার ছোট বোনটির হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছি, এক সময় আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম, সে একটু অবাক হয়ে আমার

দিকে তাকাল। কথা বলতে পারে না বলে কাজ চালানোর জন্যে তাকে কিছু কিছু শব্দ শেখানো হয়েছে। মুখের দিকে তাকিয়ে সে সেই শব্দগুলো বুঝতে পারে। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এবং আমি তার জানা শব্দগুলো ব্যবহার করে তাকে বাবার মৃত্যুসংবাদটি জানালাম। আমার ছোট বোনটি চিৎকার করে কেঁদে উঠে আমাকে জাপটে ধরল। পরমুহূর্তে সে আবার আমার মুখের দিকে তাকাল, ভয়ংকর ব্যাকুল সেই দৃষ্টি, একেবারে কাঙ্গালিনীর মতন। তার নিজের ভাষায় নিজের শব্দগুলো ব্যবহার করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আসলে মিছিমিছি বলছ তাই না?" আমি যদি বলতে পারতাম, "হ্যাঁ আমি আসলে মিছিমিছি বলছি তাহলে মুহূর্তে তার চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমার ভয়ংকর অদম্য একটা ইচ্ছে হল মুখে হাসি ফুটিয়ে বলি, "হ্যাঁ আসলে আমি মিথ্যে বলেছি। আমাদের বাবা ভালো আছেন।" কিন্তু আমি সেটা বলতে পারলাম না। নিষ্ঠুরের মতো আবার বললাম, "না। মিথ্যে নয়। আমাদের বাবা আসলেই মারা গেছেন!"

আমার ছোট বোনটি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল এবং আমি তাকে কোলে নিয়ে হেঁটে হেঁটে একটা ছোট লঞ্চে উঠলাম। বিকেলের আলো যখন ম্লান হয়ে এসেছে তখন সেই ছোট লঞ্চটি খুব দুঃখী একটা বালিকাকে নিয়ে বহুদূরে রওনা দিল। আমি এবং আমার মা সেই বুক ভেঙে যাওয়া ছোট বালিকাটির দুই পাশে চুপ করে বসে রইলাম।

আমি নিউমার্কেটের সামনে থেকে কিনে আনা কমিক দুটি তাকে দিয়েছি, অন্য সময় হলে সে কী খুশি হয়ে উঠত, আজ শুধু হাতে ধরে রেখেছে।

ছোট লঞ্চটা মেঘনার উথাল-পাতাল ঢেউয়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে, ভেতরে টিমটিমে হলুদ আলোতে আমি আমার ছোট বোনটিকে জড়িয়ে ধরে রেখেছি। ঘুমের ভেতর সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সেই রাতে সৃষ্টিকর্তার ওপর আমার খুব একটা অভিমান হয়েছিল।

লঞ্চের সেই কেবিনে আরো একজন ভদ্রমহিলা ছিলেন। গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি চোখের কোনা দিয়ে দেখলাম ভদ্রমহিলা উঠে বসে এদিক-সেদিক দেখছেন তারপর খুব সাবধানে তার ব্যাগ খুলে এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা ম্যাচ বের করলেন। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের

করে ফস করে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিলেন—আমি আমার জীবনে আর কাউকে এত তৃপ্তি করে সিগারেট খেতে দেখি নি। সিগারেট শেষ করে ভদ্রমহিলা আবার গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে গেলেন।

খুব ভোরে লঞ্চঘাটে নেমেছি, এখান থেকে রিকশা করে পিরোজপুর শহরে যেতে হবে। এই শহরে আমাদের সাজানো গোছানো বাসা ছিল, এখন কিছু নেই। শহরে কোথায় যাব, কোথায় উঠব কিছুই জানি না। রিকশা করে শহরে আসতে আসতেই অবশ্যি পরিচিত মানুষ আপনজন আমাদের কাছে ভিড় করে এল। আমাদের বাসার ঠিক সামনে ডাক্তার সাহেবের বাসা, তিনি তার বাসায় আমাদের তুললেন। ডাক্তার সাহেবের ছোট ছোট বাচ্চাগুলো একসময় আমার খুব ভক্ত ছিল এতদিন পর আমাকে দেখে চোখ বড় বড় করে দেখছে। কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

আমার মা প্রথম সুযোগ পেয়েই বললেন, তিনি কবরটা খুঁড়ে দেখতে চান, যদি সেখানে সত্যিই আমার বাবার দেহাবশেষ থেকে থাকে তুলে এনে কবরস্থানে কবর দিতে চান। বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন, তাই স্থানীয় পুলিশের লোকজন বলল কবর থেকে দেহাবশেষ তুলে ময়নাতদন্ত করে পাকিস্তান মিলিটারি অফিসারদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা করতে চায়। সারেন্ডার করার পর প্রায় লাখখানেক মিলিটারি ইন্ডিয়াতে আছে, তাদের ভেতর থেকে যুদ্ধাপরাধীদের আলাদা করে এনে বিচার করা হবে। আমাদের কোনো আপত্তি নেই, এই দেশে এরা এতগুলো মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে, কারো বিচার হবে না এটা তো হতে পারে না।

বাবার দেহাবশেষ আনার জন্যে একটা কফিন বানানো হল। নৌকায় সেই কফিন নিয়ে আমি আমার মা আর ছোট বোনকে নিয়ে রওনা দিয়েছি। আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার, পুলিশ অফিসার এবং আরো কয়েকজন। নৌকা করে মাইলখানেক যাবার পর নদীতীরে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল এবং সেই ফাঁকা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা কবর। পাকিস্তান মিলিটারি বাবাকে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছিল, জোয়ার-ভাটায় তিন দিন এই নদীতে ভেসে বেড়িয়ে এখানে নদীর কিনারায় তার শরীরটা আটকে গিয়েছিল। গ্রামের মানুষ ইচ্ছে করলেই ঠেলে আবার নদীতে ভাসিয়ে দিতে পারত—এই দেশের লক্ষ

লক্ষ মানুষের মতো তার দেহটাও নদীর পানিতে মিশে যেত। কিন্তু ঠিক কী কারণ কে জানে তারা সেটা করে নি, বাবার দেহটি তুলে এখানে কবর দিয়েছে। আজ আমি এসেছি সেই কবর খুঁড়ে তার দেহাবশেষ বের করতে।

আমার বাবা অসম্ভব রূপবান মানুষ ছিলেন, হালকা পাতলা কিশোরের মতো দেহ, কুচকুচে কালো একমাথা চুল, খাড়া নাক, উজ্জ্বল চোখ, ধবধবে ফর্সা গায়ের রং। কবর খুঁড়ে আমরা তো আর সেই মানুষটিকে বের করব না, বের হবে তার দেহাবশেষ। আমি চাই না আমার মা কিংবা ছোট বোন সেই দেহাবশেষটুকু দেখুক, তাই আমি তাদের একটু দূরে একটা গাছতলায় বসিয়ে এলাম।

আমি আর আমানুল্লাহ মিলে আমার বাবার কবরটা খুঁড়ে তার দেহাবশেষ বের করেছিলাম। সুদীর্ঘ দশ মাসে শুধু হাড়গুলো আছে, পা দুটো অল্প একটু ভাঁজ করে কবরের ভেতর শুয়ে আছেন। দুই পায়ে গাঢ় সবুজ রঙের নাইলনের দুটো মোজা অবিকৃত রয়ে গেছে। তার জীবনের শেষ দিনে যখন তিনি পায়ে মোজাগুলো পরছিলেন আমি তখন পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেই মোজাগুলো পরে এখন কবরে অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। বুলেটগুলো কোথায় আঘাত করেছিল বোঝা যাচ্ছে। একটা লেগেছে মাথায় অন্য একটা পায়ের বড় হাড়টিতে যেটা শরীরের সাথে এসে লাগে। বুলেটের নিশ্চয়ই প্রচণ্ড শক্তি, তার আঘাতে হাড়ের একটা বড় অংশ উড়ে বের হয়ে গিয়েছিল। আমি একধরনের গভীর মমতায় আমার বাবার সেই ক্ষতস্থানগুলোতে হাত বুলিয়ে দিলাম। ছেলেমানুষের মতো মনে হচ্ছিল আমার সেই স্পর্শ দিয়ে বুঝি বুলেটের সেই তীব্র আঘাতের কষ্ট মুছে দেয়া যাবে।

আমি আর আমানুল্লাহ মিলে আমার বাবার শরীরের সেই দেহাবশেষ কফিনের মাঝে তুলে তার ডালাটি বন্ধ করে মায়ের কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম। আমার মা আমার চোখের দিকে তাকালেন তারপর প্রথমবার তার "মৃত" স্বামীর জন্যে কাঁদলেন।

নৌকা করে যখন আমরা আমাদের বাবাকে ফিরিয়ে আনছিলাম আমার মা তখন কফিনটি জড়িয়ে বসে রইলেন। গভীর মমতায় সেই কফিনটিকে তিনি তার বুকে চেপে রেখেছেন, সেই দৃশ্যটি দেখতে দেখতে আমার হঠাৎ মনে হল আমার বয়স বুঝি অনেক বেড়ে গেছে!

ইরা নামের হরিণ

দেশ স্বাধীন হবার পর পিরোজপুরে এসেছি। নদীতীর থেকে বাবার দেহাবশেষ তুলে এনে কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়েছে। খুব ভোরবেলা মা কবরস্থানে গিয়ে বাবার কবরস্থানে বসে থাকেন, ফিরে আসেন বেলা হলে। রিকশা করে যান রিকশা করে ফিরে আসেন। রিকশাওয়ালাদের বলতে হয় না কোথায় যাবেন, কোথায় ফিরে যাবেন। শুধু রিকশাওয়ালা নয়—ছোট শহরে প্রায় সবাই জেনে গেছে স্বামীহারা খুব দুঃখী একজন মানুষ এই শহরে এসেছে।

আমাদের ফিরে যাবার যখন সময় হল তখন একদিন একজন আমাকে বলল, "আপনাদের একটা হরিণ ছিল না?"

"হ্যাঁ, ছিল। কেন, কী হয়েছে তার?"

"এখানে একজন লোক একটা হরিণ খুঁজে পেয়েছিল, হতে পারে সেটা আপনাদের হরিণ। দেখতে চান গিয়ে?"

আমার হঠাৎ করে ইরার কথা মনে পড়ল। ইরা ছিল ব্যাটাছেলে হরিণ, কিন্তু যখন তাকে প্রথম আনা হয় তখন সে ছিল একেবারে এইটুকুন; মায়াকাড়া চোখ দেখে মনে হয়েছিল বুঝে হরিণী শিশু। তাই তার নাম রাখা হয়েছিল ইরা। একটু বড় হবার পর আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারলাম কিন্তু হরিণ শিশুটির তার নাম নিয়ে কোনো আপত্তি ছিল না বলে সেটি আর পরিবর্তন করা হয় নি। ব্যাটাছেলে হরিণ হবার পরও সে মেয়ের নাম নিয়ে বড় হতে থাকল। বাসার পেছনে অনেক জায়গা, ইরা সেখানে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবীর বড় তৃণভোজী প্রাণীদের মাঝে মাত্র চৌদ্দটিকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করা গেছে,

এই চৌদ্দটির ভেতরে হরিণ নেই। তাই ইরাকে আমরা যতই আদর করি সেটা কখনো পোষ মানবে না; আমরা জানতাম। খুব ডাকাডাকি করলে সতর্ক পায়ে কাছে আসত, হাত থেকে কিছু একটা খেত। মাঝে মাঝে গলাটা লম্বা করে দাঁড়াত। তখন গলায় হাত বুলিয়ে দিলে মনে হয় আদরটা উপভোগ করত—কিন্তু খুব সতর্কভাবে। কিছু একটা হলেই চকিত চোখে এদিক-সেদিক তাকিয়ে ছুটে পালিয়ে দূর থেকে সতর্ক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। ভারি সুন্দর দেখাত তাকে তখন।

তাই আমাকে যখন একজন হরিণটির কথা বলল আমার ভেতর হঠাৎ করে যেন স্মৃতির একটা মেল ট্রেন ছুটে এল। আমার কেন জানি হঠাৎ করে হরিণটাকে একনজর দেখার ইচ্ছে করল। আমি খুঁজেপেতে বেশ দূরে একটা বাসায় হাজির হলাম। আমার পরিচয় দিতেই ভদ্রলোক আমাকে খুব সমাদর করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমি একটু ইতস্তত করে হরিণটার কথা জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক বললেন. "হরিণ একটা পেয়েছি সত্যি কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা আপনাদের হরিণ। আপনাদের হরিণটা শুনেছি বাসা লুট করার সময় মিলিটারিরা ধরে নিয়ে কেটেকুটে খেয়েছে।"

আমি মাথা নেড়ে তাকে জানালাম যে আমিও সেরকম শুনেছি। ভদ্রলোককে বললাম, তারপরেও আমি একবার এক নজর হরিণটাকে দেখতে চাই। এটা যদি আমাদের হরিণ হয়েও থাকে আমার ফিরিয়ে নেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে এখন মানুষই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না, হরিণ কেমন করে যাবে? তা ছাড়া ঢাকা শহরে এখনো আমাদেরই থাকার জায়গা নেই বুনো হরিণকে নিয়ে রাখব কোথায়!

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একটু আশ্বস্ত হলেন, আমাকে তার বাসার পেছনে নিতে নিতে হরিণের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে খানিকটা জ্ঞানদান করলেন। এটি কখনোই পোষ মানে না; কাজেই এই হরিণটাকে আমি কাছে থেকে দেখতে পাব না—অনেক দূরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে থাকবে।

ভদ্রলোকের কথা সত্যি হল। বাসার পেছনে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি দূরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটা হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। চকিত দৃষ্টিতে আমাদের এক নজর দেখে সেটা আরো দূরে সরে গেল। ভদ্রলোক বললেন, "কী মনে হয়? এটা

কি আপনাদের হরিণ? এত দূর থেকে তো বুঝতেও পারবেন না। এক বছরে তো বড়ও হয়েছে অনেক।"

আমি কিছু না বলে হরিণটার দিকে তাকিয়ে থাকি। হঠাৎ কী মনে হল জানি না, আগের মতো সুর করে হরিণটাকে ডাকলাম, "ই-ই-ই-ই-রা-া-া-া..."

হরিণটি চমকে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল।

আমি আবার ডাকলাম, "ই-ই-ই-রা-া-া-া..."

হরিণটি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল সে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছে। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে কয়েক পা এগিয়ে এল, দূর থেকে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখল তারপর হঠাৎ ঝোপঝাড় ভেঙে আমার দিকে ছুটে আসতে শুরু করল। হরিণের ছুটে আসার মতো সুন্দর দৃশ্য বুঝি আর কিছু নেই। ঠিক সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ছন্দময় তার পদক্ষেপ। হরিণটা কাছাকাছি এসে সতর্কভাবে আমাকে শুঁকল; তারপর একেবারে কাছে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার গলাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বড় বড় বইপত্রে লেখা আছে হরিণ পোষ মানে না, সব বইপত্র মিছে করে দিয়ে আমাদের ইরা আমার কাছে ফিরে এসেছে। ব্যাটাছেলে হরিণ তার মায়াবী চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দেখে মনে হল সে গভীর অভিমান নিয়ে আমাকে বলতে চাইছে, "তুমি এতদিন পরে এসেছ? আমি কতদিন থেকে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছি! কতদিন—"

আমি গভীর ভালবাসায় ইরার গলা জড়িয়ে ধরলাম। একটা অবোধ প্রাণীর জন্য ভালবাসায় আমার চোখে পানি এসে গেল।

হরিণের মালিক ভদ্রলোক খুব অপ্রস্তুত হলেন, বললেন, "কী আশ্চর্য! এটা তো আপনাদেরই হরিণ! আমি শুনেছিলাম হরিণ কখনো পোষ মানে না। অথচ এটা আপনাকে কী সুন্দর মনে রেখেছে!"

ভদ্রলোক তখন তখনই হরিণটা আমাকে দিয়ে দিতে চাইলেন। আমি বললাম, "না। না— এই হরিণ নিয়ে আমি কোথায় যাব? আমাদের নিজেদের থাকার জায়গার ঠিক নেই, আর হরিণ!"

আমার সাথে এসেছিল আমাদের আমানুল্লাহ; সে আমাকে বাধা দিয়ে বলল, "আমি এই হরিণ নিয়ে যাব।"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "হরিণ নিয়ে যাবে? কোথায় নিয়ে যাবে?"

"বাড়ি নিয়ে যাব।"

"বাড়ি নিয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

আমি বললাম, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি জান রাস্তাঘাট নেই, সব ব্রিজ ভাঙ্গা! মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে না, আর তুমি হরিণ নিয়ে যেতে চাও?"

আমানুল্লাহ দাঁত বের করে হাসল, বলল, "সেটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও!"

আমি আমানুল্লাহকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম। সে বুঝতে রাজি হল না। সত্যি সত্যি সে আমাদের সেই হরিণটি নিয়ে রওনা দিয়ে দিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে কোনো পথঘাট নেই, সেই অবস্থায় আমানুল্লাহ একটা হরিণ নিয়ে দেশের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় পাড়ি দিচ্ছে সেই কাহিনীটি ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ। ভালো পরিচালক হলে শুধু এই কাহিনীটা দিয়েই একটা ফাটাফাটি সিনেমা বানাতে পারতেন।

আমাদের ইরার পরবর্তী জীবনটুকু ছিল খুব চমৎকার। গ্রামের বাড়িতে সে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াত। আজ এর ক্ষেতের ধান খেয়ে ফেলছে পরদিন আরেকজনের সবজি ক্ষেত নষ্ট করছে কিন্তু গ্রামের মানুষ কিছু মনে করত না, এক ধরনের স্নেহ নিয়ে তার অত্যাচার সহ্য করত।

তারপর ইরা নামের সেই হরিণটি বড় হল। মাথায় মস্ত বড় শিং, দৃপ্ত ভঙ্গিতে সে মাথা তুলে দাঁড়ায়। নিঃসঙ্গ হরিণটির মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা। হরিণটি খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল, খানিকটা বিপজ্জনক। গ্রামের সব মানুষ অনেক ভেবেচিন্তে একদিন ইরা নামের আমাদের এই হরিণটি ধরে কেটেকুটে খেয়ে ফেলল!

জীবনের সত্যি কাহিনীগুলো এত মায়াদয়াহীন নির্মম হয় কেন কে বলতে পারবে?

আফজাল

বাসায় এসে দেখি আফজাল বারান্দায় বসে আছে। আমরা যখন কুমিল্লায় ছিলাম তখন সে আমাদের বাসার কাজকর্মে সাহায্য করত। সহজ–সরল মানুষ তবে খুব হাসিখুশি। বাসায় কাজ শেষ করে রাত্রিবেলায় পা ছড়িয়ে বসে সে গল্প করতে পছন্দ করত। তার গল্পের একটা বড় অংশ ছিল বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের বিয়ে নিয়ে! তার বিয়ের সময় সে দুটো বাঁশের খুঁটি পুঁতে কপিকল দিয়ে কীভাবে দুটি চেয়ারকে শূন্যে তুলে নেবে এবং সেই চেয়ারে হুমায়ূন আহমেদ এবং তার নবপরিণীতা বধূ কীভাবে বসে থাকবে সেটা নিয়ে তার অনেক দীর্ঘ পরিকল্পনা ছিল। বাজি বারুদ ফোটানো হবে এবং শূন্যে ঝুলে থাকা অবস্থায় কীভাবে বর এবং বধূ হ্যান্ডশেক করবে সেটা কল্পনা করার সময় আফজালের মুখে এগাল ওগাল জোড়া হাসি ফুটে উঠত। মানুষটা যে আর দশজন মানুষের মতো ছিল না তার অনেক প্রমাণ আছে। একদিন রাতে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল বারান্দার নিচে—অচেতন হয়ে পড়ে আছে। ধরাধরি করে তুলে এনে মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার পর কী হয়েছে জিজ্ঞেস করা হল। আফজাল ইতস্তত করে বলল, "বাবা এসেছিলেন।"

"বাবা এলে তুমি অজ্ঞান হয়ে বারান্দার নিচে পড়ে থাকবে কেন?"

আফজাল বলল, "বাবার কোলে উঠতে চাইলাম।"

"বাবার কোলে উঠতে চাইলে?" আমরা চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করি, "তুমি এত বড় একজন মানুষ তোমার বাবার কোলে উঠতে চাইছ কেন?"

আফজাল একটু রেগে গিয়ে বলল, "কেন? তাতে হয়েছে কী? একজন ছেলে তার বাবার কোলে উঠতে পারে না?"

আমরা পিতা-সন্তানের ভালবাসার বহির্প্রকাশের জটিলতায় না গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ঠিক আছে। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন?"

এই বেলা আফজালকে একটু মনমরা দেখায়। তার কথাবার্তা শুনে মনে হল বাবার কোলে ওঠার পর সে আবিষ্কার করল আসলে বাবা নেই। তখন দড়াম করে-পতন এবং জ্ঞান হারানো। কোনো হিসেবেই এটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প নয় কিন্তু আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। আফজালের কল্পনার একটা জগৎ আছে, সেখানে সম্ভব এবং অসম্ভবের বেড়াজাল ঢোকানো ঠিক নয়।

কুমিল্লা থেকে পিরোজপুর চলে যাবার পর থেকে আফজালের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে দেশ স্বাধীন হবার পর এখন আবার তার সাথে দেখা।

আমরা তখন নয়াপল্টনে একটা বাসা ভাড়া করে থাকি। আফজালকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের খোঁজ পেলে কেমন করে?"

"ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করে করে বের করে ফেলেছি।"

"কী জিজ্ঞেস করেছ?"

"বড় দাদা এবং ছোট দাদার বাসা কোথায়?"

আফজালের সাথে কথা বলে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম, সত্যি সত্যি মানুষজনকে আমাদের কথা জিজ্ঞেস করতে করতে ঢাকা শহরের মতো জায়গায় সে আমাদের খোঁজ বের করে ফেলেছে। আমরাও তার খোঁজখবর নিলাম এবং চমৎকৃত হলাম! আমাদের আফজাল একজন মুক্তিযোদ্ধা।

"তুমি মুক্তিযোদ্ধা! বাহ্! কী চমৎকার। দেশের জন্য যুদ্ধ করা কী সাংঘাতিক ব্যাপার!"

আফজাল লাজুক মুখে হেসে বলল, "আসলে হয়েছে কী জানেন?"

"কী হয়েছে?"

"আমার এক ভাই বলেছে দেশে যুদ্ধ হচ্ছে, খুব বড় ঝামেলা। রাজাকার বাহিনীতে লোক নিচ্ছে— জয়েন করে ফেল। মাসে মাসে বেতন। তাই শুনে আমি গ্রাম থেকে রওনা দিয়েছি, পথে হঠাৎ দেখি মুক্তিযোদ্ধার দল যাচ্ছে।

আমাকে জিজ্ঞেস করল, কই যাস! আমি তো আর বলতে পারি না রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছি তাই বললাম এই তো মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছি। তখন তারা আমাকে নিয়ে ফেলল।"

এই হচ্ছে আমাদের আফজালের বুদ্ধির নমুনা। কপাল ভালো রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধার দলটার সাথে দেখা হয়েছিল তা না হলে কী যে হত তার কপালে কে জানে। আমরা তার মুখে যুদ্ধের গল্প শুনতে চাইলাম, সে ঘুরেফিরে গুলির বাক্স মাথায় করে টেনে নেওয়ার গল্প শোনাল। যারা তাকে দলে নিয়েছে তারা তাকে মোটামুটি গুলির বাক্স টেনে নেওয়ার কাজেই ব্যবহার করেছে।

প্রাথমিক কথাবার্তা শেষ হবার পর আফজাল কেন এসেছে সেটা জানাল। যুদ্ধের পর কুমিল্লা গিয়ে সে খবর পেয়েছে আমার বাবা যুদ্ধের সময় মারা গেছেন। আমার মায়ের একা এখন পুরো পরিবারটাকে টেনে নিতে হবে, সেটা করবেন কীভাবে আফজাল ভেবে পাচ্ছে না। এই দুঃসময়ে আমার মায়ের পাশে যদি কেউ না দাঁড়ায় তা হলে কেমন করে হবে। আফজাল তাই চলে এসেছে। আমার মাকে বলেছে, "আমি আপনার আরেকজন ছেলে। আপনার সাথে আমি আছি।"

আমি আগেও দেখেছি যারা খুব সাধারণ মানুষ তাদের ভালবাসাগুলো হয় এরকম তীব্র এবং এরকম সোজাসাপটা। কাজেই আফজাল আমাদের বাসায় উঠে এল।

দুই একদিন যাবার পর আমরা বুঝতে পারলাম আমার মাকে সাহায্য করার তার একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও আছে। সেটা হচ্ছে কৃচ্ছ্রসাধন। প্রথম দিনেই সে রান্নাঘরে ঢুকে রান্নার দায়িত্ব নিয়ে নিল। আমার মা খুব আপত্তি করলেন, বললেন, "বাবা আফজাল, আগে তুমি বাসায় কাজ করতে সেটা ঠিক ছিল। কিন্তু এখন তুমি মুক্তিযুদ্ধ করে এসেছ, একজন মুক্তিযোদ্ধা। একজন মুক্তিযোদ্ধা কেন আমার বাসায় রান্না করবে?"

আফজাল বলল, "না আম্মা, আপনি একা একা পারবেন না। আমি আছি। আমি আসছি আপনাকে সাহায্য করতে, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।"

কাজেই আফজাল মোটামুটি দায়িত্ব নিয়ে নিল। আমার মায়ের সংসার খরচ বাঁচানোর জন্য সে বাজার করত কম। রান্না করত কম এবং সারা দিন

ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করার পর যখন বাসায় ফিরে আসতাম তখন আমরা খেতেও পেতাম কম। আফজাল প্লেটে ভাত দিয়ে ছোট এক টুকরো মাংস এবং এক হাতা ঝোল দিয়ে বসে থাকত। আরো খেতে চাইলেও মুখ ফুটে তাকে বলতে পারি না কারণ রীতিমতো যক্ষের মতন সে ডেকচি আগলে রাখত। সে জিজ্ঞেস করত আরো চাই কি না কিন্তু গলার স্বর শুনেই বুঝতে পারি সে কোন উত্তরটা চাইছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও শৈশবে এরকম সমস্যার মাঝে পড়েছিলেন—সেটা তার আত্মজীবনীতে পড়েছি!

এভাবে কয়েকদিন যাবার পর আমরা ভাইবোনেরা মায়ের কাছে রীতিমতো করুণ আবেদন করলাম, অন্য সবকিছুতে কৃচ্ছ্রসাধন হোক, কিন্তু দুই বেলা যেন পেট ভরে খেতে পারি।

কাজটা খুব সহজ হত কি না জানি না, কিন্তু একদিন হঠাৎ আফজালকে খুব চঞ্চল দেখা গেল। তার এলাকা থেকে খবর এসেছে তাকে এখনই যেতে হবে। তার নেতা খবর পাঠিয়েছে সবাইকে হাজির হতে হবে। আমরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নেতাটি কে?"

আফজাল বুক উঁচু করে বলল, "খন্দকার মোশতাক আহমেদ।"

তখনো খন্দকার মোশতাক আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে খুন করে কুখ্যাত হয় নি তাই তার নামটি শুনে আলাদা করে কিছু মনে করি নি।

আফজাল তাড়াহুড়ো করে চলে গেল—সে আর কখনো ফিরে আসে নি।

আমাদের পরিবারের সবাই মাঝে মাঝেই এই সাদাসিধে হৃদয়বান ছেলেটার কথা মনে করি। কোথায় আছে সে? কেমন আছে?

সিগারেট

আমার বাবা অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখাত যখন তিনি সিগারেট খেতেন। তাঁর সিগারেট খাবার একটা সুন্দর ভঙ্গি ছিল যেটা আমি আর কোথাও দেখি নি। মধ্যমা আর তর্জনীর ফাঁকে সিগারেটটা রেখে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বুড়ো আঙুল এবং তর্জনীর মাঝখানের অংশটুকু মুখে লাগিয়ে সিগারেট টানতেন। বাবা একটু ভাবুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক হাত কোমরে রেখে অন্য হাতে সিগারেট টানতে টানতে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু আনমনা হয়ে যেতেন। সেই ভঙ্গিটি এক কথায় ছিল অপূর্ব। তাই আমি একেবারে অনেক ছোট থাকতেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে যখন বড় হব তখন আমি বাবার মতো করে সিগারেট খাব!

বড় হওয়ার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি তখন মনে হল এখন নিশ্চয়ই বড় হয়েছি, এখন সিগারেট খাওয়া শুরু করতে হয়। তাই খুব কষ্ট করে আমি সিগারেট খাওয়া শেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। দামি সিগারেট খাবার পয়সা নেই তাই সস্তা সিগারেট দিয়ে সিগারেট খাওয়া শিখছি। সেটা যে কী কষ্ট সেটা আমি বলে বোঝাতে পারব না। বিদঘুটে গন্ধ, সিগারেটের ধোঁয়া বুকের ভেতর গিয়ে খকখক করে কাশি, মনে হয় নাড়ি উল্টে আসবে, কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দিলাম না।

শেষ পর্যন্ত আমি সিগারেট খাওয়া শিখে গেলাম। সিগারেট খেতে যত আনন্দ তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ সেটা দশজনকে দেখিয়ে।

একদিন কোথায় জানি যাচ্ছি, হঠাৎ সিগারেট খাবার ইচ্ছে করল। আমি রাস্তার পাশের একটা দোকান থেকে একশলা সিগারেট কিনে মুখে লাগিয়ে আয়েশ করে একটা টান দিয়েছি তখন একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। রাস্তার পাশে একটা গাড়ি থেমেছে এবং সেই গাড়ি থেকে দুজন ভদ্রমহিলা নেমে এলেন। তারা অন্য কোথাও যাচ্ছিলেন কিন্তু একজন আমাকে দেখে থেমে গেলেন। কেমন জানি একটা বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে আহত গলায় বললেন, "তুমি এত ছোট ছেলে সিগারেট খাও?"

আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম। রাস্তার মাঝখানে একজন আমাকে এভাবে সিগারেট খাবার জন্য ধমক দিতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারি নি। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "আমি মোটেও ছোট ছেলে না। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।"

আমার কথায় কোনো কাজ হল না। ভদ্রমহিলা কেমন যেন ব্যথিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়লেন, বললেন, "না। এত ছোট ছেলে তুমি সিগারেট খাবে না।"

আমি কোনোমতে তার দৃষ্টি থেকে সরে এলাম—সিগারেট টানতে টানতেই।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সেই ভদ্রমহিলার সাথে এখন দেখা হলে বলতাম, "এই দেখেন! আমি এখন আর ছোট ছেলে না—আমি কিন্তু আর সিগারেট খাই না!"

কিন্তু তার সাথে আর কখনো দেখা হয় নি!

কার্টুন

একাত্তর সালে যখন সারা দেশ খুব দুঃসময়ের মাঝে দিয়ে যাচ্ছে তখন ভাবতাম দেশটা স্বাধীন হয়ে গেলে আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। যখন দেশটা স্বাধীন হল সত্যি সত্যি আমাদের মনে হল আমাদের আর দুঃখ-কষ্ট নেই। একেবারে নিজের একটা দেশ, নিজের জাতীয় পতাকা, নিজের জাতীয় সঙ্গীত। রাস্তা দিয়ে হাঁটি ডানে বাঁয়ে তাকাতে হয় না যে কোনো পাকিস্তানি মিলিটারি কিংবা রাজাকার ঘাপটি মেরে বসে আছে কি না! ইউনিভার্সিটিতে সবাই মিলে হইচই করি। নাট্যকাররা নাটক লিখছেন, সেই নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে; কবিরা কবিতা লিখছেন, সেই কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে; শিল্পীরা ছবি আঁকছেন, সেই ছবি দশজন দেখছেন সব মিলিয়ে কী চমৎকার পরিবেশ। আমরা সবাই দেখি আর মনে মনে ভাবি এটাকেই নিশ্চয়ই রেনেসাঁ বলে! আমাদের নিজেদের একটা রেনেসাঁ শুরু হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াব।

কিন্তু আমাদের পরিবারের একটা ছোট সমস্যা—যুদ্ধে বাবা মারা গেছেন সংসার চালানোর টাকা নেই। অর্থাভাব বলে যে বিষয়টা গল্প উপন্যাসে পড়েছি সেটা নিজের চোখে দেখতে শুরু করেছি। ভয়ংকর অবস্থা, মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায় যে পরের বেলা কী খাওয়া হবে সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা! আমার মা কীভাবে সংসার চালাচ্ছেন সেটা একটা রহস্য।

কাজেই আমি বুঝে গেলাম কিছু টাকা-পয়সা রোজগার করতে হবে। খুঁজেপেতে একটা টিউশানি বের করেছি, কাউকে তার কথা বলতে লজ্জা করে। গোপনে ছাত্রের বাসায় গিয়ে পড়িয়ে আসি, গাধা টাইপের ছাত্র কিছু বোঝে না।

কী বোঝাতে হবে কেন বোঝাতে হবে সেটাও বুঝি না। বাসাতেও কেউ জানে না, ক্লাসের বন্ধুবান্ধবেরাও জানে না। এর মাঝে পত্র–পত্রিকার অফিসে ঘোরাঘুরি করে নতুন একটা কাজ আবিষ্কার করলাম, সেটা হচ্ছে কার্টুন আঁকা। আমাদের সব ভাই বোনই ছবি আঁকতে পারে, আমিও পারি। একদিন ছোট ছোট সাতটা কার্টুন এঁকে গণকণ্ঠ অফিসে গিয়েছি। তখনো আওয়ামী লীগ ভেঙে জাসদ বের হয়ে যায় নি—বের হবে হবে করছে। গণকণ্ঠ হবে জাসদের পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদক একজন বিখ্যাত কবি আমার কার্টুনগুলো দেখে খুব পছন্দ করলেন। পরের দিন থেকেই প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানোর ব্যবস্থা করলেন। একটা কার্টুন আমার এখনো মনে আছে—একটা শাড়িকে দড়ি হিসেবে ব্যবহার করে একজন মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে। নিচে তার স্ত্রী হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, "ওগো, তুমি আমার এত দামি শাড়িটা এভাবে নষ্ট করলে!" সেই বিখ্যাত কবি এবং সম্পাদক আমাকে বললেন আমি যেন প্রতিদিন একটা করে কার্টুন দিই—তিনি তার পত্রিকায় ছাপবেন।

গণকণ্ঠ তখন খুব জনপ্রিয় পত্রিকা। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের দুঃশাসন মোটামুটি শুরু হয়েছে, দেশের মানুষজন ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠছে। অন্য কোনো পত্রিকা প্রতিবাদ করার সাহস পায় না, গণকণ্ঠ জোরগলায় প্রতিবাদ করে। কাজেই লোকজন খুব গণকণ্ঠ পড়ে। সেই পত্রিকায় আমার কার্টুন নিয়মিত ছাপা হচ্ছে—অহংকারে আমার মাটিতে পা পড়ে না। কার্টুনের শিল্পী হিসেবে নিজের জন্য একটা ছদ্মনাম তৈরি করেছি, সেটা হচ্ছে বিচ্ছু।

কাজেই বিচ্ছু নাম দিয়ে আমি নিয়মিত কার্টুন আঁকা শুরু করেছি। প্রত্যেকদিন একটা কার্টুন আঁকা খুব সহজ ব্যাপার নয়, সারাক্ষণই আমাকে কার্টুনের আইডিয়া খুঁজে বের করতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টা চোখকান খোলা রাখি, যেটাই দেখি সেটাকেই কার্টুন বানিয়ে ফেলা যায় কি না ভেবে দেখি। কার্টুন দেখে সবাই হাসে কিন্তু যে মানুষ সেই কার্টুনটি তৈরি করে তার জীবনে হাস্যকৌতুক খুব বেশি নেই—আমি তখন সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। এর মাঝে অনেক হইচই করে জাসদের জন্ম হল। আনুষ্ঠানিকভাবে তার ঘোষণা দিয়ে গণকণ্ঠের একটা বিশেষ বুলেটিন বের হয়েছে, সেই বুলেটিনের এক কোনায় আমার আঁকা কার্টুন, এক মোরগ তার গিন্নি মুরগিকে বলছে, "তুমি

আমাকে কোনো দাম দিলে না, তুমি জান ঈদের বাজারে আমার দাম আট টাকার কম না!" তখন মোরগের জন্য আট টাকা ছিল মাত্রাছাড়া দাম।

কার্টুন আঁকতে আঁকতে আমি আরেকটা চমকপ্রদ বিষয় আবিষ্কার করলাম। কার্টুনের হাস্যকৌতুকটা আসে ঠাট্টা তামাশা এবং পরিহাসের ভেতর দিয়ে। আমার আঁকা কার্টুনের মাঝেও একটা ঠাট্টা তামাশা এবং পরিহাসের জন্ম নিয়েছে তবে সেই ঠাট্টা তামাশা এবং পরিহাসটুকু আমার নিজেকে নিয়ে। আমি প্রতিদিন গণকণ্ঠ পত্রিকার জন্য কার্টুন আঁকছি কিন্তু পত্রিকার লোকজন সে জন্য আমাকে পারিশ্রমিক দিতে চান না। প্রতি কার্টুনের জন্য একটা সম্মানী ধরে দিলে আমার খরচটা চলে যেত। কিন্তু তারা সেটা করলেন না। গণকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক আমাকে ঘোরাতে শুরু করলেন। আমি এবং আমার পুরো পরিবার তখন এক ধরনের চরম অর্থকষ্টে। একটু টাকা পেলে কী উপকার হবে সেটা বোঝানো যাবে না, কিন্তু গণকণ্ঠ পত্রিকার কর্মকর্তারা সেটা বুঝতে চাইতেন না। আমার যখন খুব টাকার দরকার হত লাজলজ্জার মাথা খুইয়ে গণকণ্ঠের সম্পাদকের সাথে দেখা করতাম। তিনি তখন কত বড় কবি—পৃথিবীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য, মানুষের হৃদয়ের ভালবাসা, দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা তার কবিতা দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ ছাত্র জীবন চালানোর জন্যে যে প্রতিদিন কার্টুন এঁকে যাচ্ছে তার জীবনের যন্ত্রণাটা বুঝলেন না। আমাকে দেখে একটু বিরক্ত হয়ে একটা স্লিপ লিখে আরেকজনের কাছে পাঠাতেন, তিনি আরেকটু বিরক্ত হয়ে আরেকজনের কাছে পাঠাতেন, সেখানে বিখ্যাত তাত্ত্বিক নেতারা বসে থাকতেন, সমাজতন্ত্র দিয়ে দেশের মানুষের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা দূর করা নিয়ে আলোচনা হত কিন্তু আমার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা তাদের চোখে পড়ত না! দশ জায়গা ঘুরিয়ে অল্প কয়টি টাকা ধরিয়ে তারা আমায় বিদায় করে দিতেন!

আমার জীবনে সেটাই ছিল মস্ত বড় কার্টুন! সেই কার্টুনের পরিহাসটুকু আমি ছাড়া আর কেউ জানত না!

লেখক

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের একমাত্র সাপ্তাহিকীটি ছিল বিচিত্রা। তার সম্পাদক ছিলেন শাহাদাত চৌধুরী, আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তারা খুব আগ্রহ নিয়ে প্রতি সপ্তাহে বিচিত্রার জন্য অপেক্ষা করতাম। উঁচুমার্গের আরো সাহিত্য পত্রিকা যে একেবারে ছিল না তা নয় কিন্তু বিচিত্রা ছিল একেবারে ভিন্ন ধরনের, একই সাথে সেটা ছিল সাহিত্য পত্রিকা, সাংস্কৃতিক পত্রিকা, বিনোদন পত্রিকা এবং সবচেয়ে বড় কথা বিশ্লেষণধর্মী সাংবাদিকতার পত্রিকা। বিচিত্রায় প্রকাশিত লেখাগুলো বিশ্লেষণ করে এই দেশের সত্যিকার ইতিহাসটুকু বের করে ফেলা সম্ভব।

সেই বিচিত্রায় বাংলাদেশের প্রতিভাবান তরুণ এবং প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকরা লেখালেখি করেন। আমার কী মনে হল কে জানে একদিন সেই বিচিত্রায় একটা গল্প লিখে পাঠালাম। গল্পটার নাম ছেলেমানুষী—মানুষের বাচ্চা কেটেকুটে খেয়ে ফেলা সংক্রান্ত ভয়াবহ একটা গল্প। পরের সপ্তাহে বিচিত্রা খুলে আমার রীতিমতো হার্ট অ্যাটাক হবার অবস্থা। আমার গল্পটা ছাপা হয়েছে, গল্পের শুরুতে একটা চমৎকার ছবি তার উপরে আমার গল্পের শিরোনাম এবং আমার নিজের নাম। দেখে আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। আমার বন্ধুবান্ধবেরা অবিশ্বাসের চোখে একবার সেই বিচিত্রার দিকে তাকায় আরেকবার আমার দিকে তাকায়। আমি মোটামুটিভাবে রাতারাতি লেখক হয়ে গেলাম। এলোমেলো চুল, চোখে চশমা এবং মুখে সিগারেট নিয়ে আমি উদাস উদাস একটা ভাব ধরে ঘুরে বেড়াই। ছোট ছোট বাচ্চাকে কেটেকুটে খাওয়া নিয়ে গল্প লেখার বিষয়টা অবশ্য

কেউ খুব সহজভাবে নিল না, অনেকেই ধরে নিল আমার সম্ভবত মানসিক সমস্যা আছে। যারা একটু আঁতেল টাইপের তারা এই গল্পটির আরো কোনো গূঢ় অর্থ আছে কি না সেটা নিয়ে আমার সাথে কথাবার্তা চালাতে লাগল।

প্রথম গল্পটা ছাপা হবার পর আমার সাহস বেড়েছে। আমি তখন 'কপোট্রনিক ভালবাসা' নামে একটা সায়েন্স ফিকশান লিখে সেটা একেবারে নিজের হাতে বিচিত্রা অফিসে শাহাদাত চৌধুরীর হাতে দিয়ে এসেছি। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই সেটাও বিচিত্রায় ছাপা হয়ে গেল। আমি তখন পুরোদস্তুর লেখক। অহংকারে আমার মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু তার পরের সপ্তাহে বিচিত্রা খুলে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, একজন পাঠক আমার বিরুদ্ধে একটা চিঠি লিখেছেন। "কপোট্রনিক ভালবাসা" গল্পটি নাকি আমি "আইভা" নামে একটা রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশান থেকে টুকলিফাই করেছি। আমার বয়স কম এবং মেজাজ গরম, ইচ্ছে হল সেই পত্র লেখককে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলি। আমার বিরুদ্ধে এতবড় অপবাদটা কীভাবে খণ্ডন করা যায় সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে থাকি; কোন ভাষায় প্রতিবাদলিপি পাঠানো যায় সেটা নিয়ে পরিকল্পনা করতে করতে আমার মাথায় অন্য একটা আইডিয়া এল। আমি ঠিক করলাম কোনো রকম প্রতিবাদ না করে আমি গোটা দশেক কপোট্রনিক গল্প লিখব! একটা গল্প টুকলিফাই করে বড়জোর একটা গল্প লেখা যায় কিন্তু নিশ্চয়ই দশটা গল্প লেখা যায় না। তাই মোটামুটি কুটির শিল্পের মতো আমার কপোট্রনিক গল্প বের হতে লাগল। তার নামও এক ধাঁচের—কপোট্রনিক ভায়োলেন্স, কপোট্রনিক বিভ্রান্তি, কপোট্রনিক প্রেরণা, কপোট্রনিক ভবিষ্যৎ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার কুটির শিল্পে কাজ হল, যিনি বিচিত্রায় আমার বিরুদ্ধে চিঠি লিখেছিলেন তার সাথেই একদিন দেখা হল, তিনি বললেন, "ইয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে একটা চিঠি লিখেছিলাম তারপর দেখি একটার পর একটা কপোট্রনিক লেখা বেরুচ্ছেই! বেরুচ্ছেই।"

অনেকগুলো কপোট্রনিক গল্প হওয়ার পর আমার গ্রন্থকার হওয়ার শখ হল। আমি আমার পাণ্ডুলিপি নিয়ে মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহার সাথে দেখা করলাম। তিনি গল্পগুলো দেখে সেটা দিয়ে একটা বই বের করতে রাজি হলেন তবে একটা শর্তে। বইটির নাম আমার দেওয়া "কপোট্রনিক সুখ দুঃখ" দেওয়া যাবে না—

এরকম জটিল নামের বই কেউ কিনবে না, এর নাম দিতে হবে 'রবোটের গল্প' ধরনের সহজ একটা নাম। আমি রাজি হলাম না, বললাম আমার দেওয়া নাম ছাড়া অন্য নামে আমি বই ছাপাতে রাজি নই। চিত্তরঞ্জন সাহা শেষ পর্যন্ত আমার এই বই বের করতে রাজি হলেন। বইটি যখন বের হল তার কপিটি হাতে নিয়ে আমার বুকের ভেতর যে শিহরনের সৃষ্টি হয়েছিল আমি আর কখনো সেই শিহরন অনুভব করি নি। আর কখনো করব বলেও মনে হয় না।

কপোট্রন শব্দটা নিয়ে প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহার ভেতরে যে আশংকা ছিল সেটা সত্য হয় নি। বেশির ভাগ মানুষই জানত না যে এটা আমার একটা বানানো শব্দ। আমার খুব মজা লাগল যখন দেখলাম একজন কবি খুব সিরিয়াস একটা কবিতায় এই কপোট্রন শব্দটা ব্যবহার করেছেন। মগবাজারে বহুদিন একটা দোকানের নামের মাঝে কপোট্রন শব্দটা ব্যবহার হতে দেখেছি। মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহাও আমার বইটি বের করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি এরকম বই আরো আছে?"

আমার কাছে লেখা ছিল না কিন্তু গ্রন্থকার হবার প্রচণ্ড বাসনায় বলে ফেললাম, "হ্যাঁ আছে।"

"নিয়ে আসবেন। সেটাও ছাপিয়ে দেব।"

আমি তখন গণকণ্ঠে কার্টুনের সাথে সাথে একটা কমিক স্ট্রিপ আঁকি তার নাম মহাকাশে মহাত্রাস। সেই কমিক স্ট্রিপটির কাহিনীটিকে উপন্যাসের রূপ দিয়ে দুই দিনের মাঝে লিখে ফেলে আবার মুক্তধারায় হাজির হলাম! এত কম সময়ে আর কেউ কখনো বই লিখতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।

একদিকে যখন আমি সায়েন্স ফিকশান লিখছি অন্যদিকে আমি তখন 'হাতকাটা রবিন' নাম দিয়ে একটা কিশোর উপন্যাস লিখেছি। আমি একদিন একটা বড় খামের ভেতর সেটা ভরে মাওলা ব্রাদার্সের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। কয়েকদিন পর মাওলা ব্রাদার্সের মালিক মোঃ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে আমার কাছে চিঠি এল, তিনি লিখেছেন যে বইটা তিনি ছাপবেন; আমার সাথে সামনাসামনি কথা বলতে চান।

আমি পরের দিনই বাংলাবাজারে তার কাছে হাজির হলাম। জাহাঙ্গীর সাহেব বললেন বইটার সবকিছু ঠিক আছে শুধু একটা সমস্যা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী সমস্যা?"

"বাচ্চাদের বই হিসেবে এই বইটা একটু বড়। বড় বইয়ের দামও বেশি হয়। আমাদের দেশের বাচ্চাকাচ্চাদের হাতে তো বেশি টাকা-পয়সা থাকে না তাই বইয়ের দাম বেশি হলে সেই বই তারা কিনতে পারে না। আপনি যদি চান তাহলে এই বইটাই ছাপব কিন্তু আমার মনে হয় একটু ছোট হলে ভালো হয়।"

আমি বললাম, "কোনো সমস্যা নেই। আমি ছোট করে দেব।"

আমি পাণ্ডুলিপি বাসায় নিয়ে এসে একরাতের মাঝে এর এক-তৃতীয়াংশ কেটে ফেলে দিলাম! এতদিন পর সেই কথা মনে হলে আমার ভারি কষ্ট হয়! গ্রন্থকার হওয়ার জন্য এত লোভ না করলে কী এমন ক্ষতি হত? সত্যিকারের 'হাত কাটা রবিন' বইটা তো আর কেউ কোনোদিন পড়তে পারল না!

মাছের গল্প ১

হাত দিয়ে কাজ করতে আমার সব সময়েই ভালো লাগে, তাই ক্লাসে প্রায় সময়েই ফাঁকি দিলেও আমি কখনো প্র্যাকটিকেল ক্লাস ফাঁকি দেই না। প্রত্যেকটা প্র্যাকটিকেল খুব মনোযোগ দিয়ে করি। একদিন কনডাক্টিভিটি সংক্রান্ত একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি, কাচের বীকারে সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ, হঠাৎ করে আমার হাতে এক ফোঁটা এসে পড়ল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সেখানে কালো একটা দাগ হয়ে গেল, একেবারে ঘষেও সেই দাগ তোলা যায় না। মোটামুটিভাবে উপরের চামড়াটুকু সরে ভেতর থেকে নূতন চামড়া বের হয়ে না আসা পর্যন্ত দাগটা হাতে রয়ে গেল।

আমার মাথায় সবসময় নানারকম উদ্ভট চিন্তা খেলা করে, এবারেও তাই হল, মনে হল এই সিলভার নাইট্রেট দিয়ে যদি হাতে একটা ছবি আঁকি তাহলে সেই ছবিটা দেখাবে চমৎকার। মানুষ শরীরে নানারকম উল্কি আঁকে, এটা হবে একটা উল্কির মতো। উল্কি হচ্ছে একটা পাকাপাকি অবস্থা, একবার শরীরের কোথাও উল্কি আঁকা হলে সেটা আর সরানো যায় না। কিন্তু আমার এই উল্কি হবে সাময়িক। সপ্তাহ দুয়েক থাকবে তারপর ধীরে ধীরে উঠে যাবে। কাজেই একদিন প্র্যাকটিকেল ক্লাসে বসে স্যারদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে বাম হাতে একটা মাছের ছবি আঁকলাম। ছেলেবেলা থেকে ছবি আঁকি কাজেই মাছটা এক কথায় হল অপূর্ব। আমার শিল্পকর্ম দেখে আমার বন্ধুবান্ধব এক কথায় মুগ্ধ হয়ে গেল।

হাতে যখন এক ফোঁটা সিলভার নাইট্রেট পড়েছিল তখন সেখানে কোনো ব্যথা বা যন্ত্রণা হয় নি, শুধু পাকা একটা রং হয়েছিল। কিন্তু হাতের মাঝে এই

অপূর্ব ছবিটা আঁকার পর আমি একটু অস্বস্তি নিয়ে আবিষ্কার করলাম সেখানে সূক্ষ্ম একটা জ্বালা অনুভব করছি। ধীরে ধীরে সেই সূক্ষ্ম জ্বালা টনটনে যন্ত্রণা এবং টনটনে যন্ত্রণা ভয়ংকর যন্ত্রণায় রূপ নিল। আমি হাতে যে মাছটি এঁকেছি দেখতে পেলাম সেই মাছ ফুলে উঠেছে। শুধু যে ফুলে উঠেছে তা নয় টকটকে লাল হয়ে দগদগে ঘায়ে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি যন্ত্রণা সহ্য করে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকি, তার মাঝে একটা বিস্ময়কর সৌন্দর্য এসে ভর করেছে। সাদামাটা মাছটা একেবারে একটা জীবন্ত মাছের মতো দেখাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে সেটা বুঝি লাফ দিয়ে হাত থেকে বের হয়ে আসবে।

মাছের রূপে তৈরি করা এই দগদগে ঘা নিজের থেকে সেরে যাবে ভেবে আমি আরো এক দিন অপেক্ষা করলাম কিন্তু সেটা সেরে না গিয়ে আরো ভয়ংকর রূপ নিল। হাতের মাছটি পুরোপুরি জীবন্ত মাছের রূপ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং আমি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকি। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার যে আমি কাউকে সেটা বলতেও পারি না!

শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না দেখে আমি আমাদের কার্জন হলের পাশের মেডিকেল কলেজে ইমার্জেন্সি বিভাগে হাজির হলাম। কেউ যেন দেখতে না পায় সেভাবে হাতটা ঢেকে রেখেছি। একটু পরেই ডাক্তার এলেন দেখতে। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

আমি মনে মনে বললাম, "হে ধরণী দ্বিধা হও।" ধরণী দ্বিধা হল না। তাই বললাম, "না মানে হয়েছে কী, হাতের মাঝে ইয়ে মানে ভাবলাম একটা মাছ মানে ইয়ে ঠিক বুঝতে পারি নাই তখন মানে ইয়ে—"

ডাক্তার ভদ্রলোক আমার আমতা আমতা ভাব দেখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেই ঢেকে রাখা শার্টের হাতা টেনে সরালেন এবং চমকে পিছনে সরে গেলেন, বললেন, "ও মাই গড!"

আমার শিল্পকর্ম তখন পুরোপুরি বিকশিত হয়েছে। লাল টকটকে একটা মাছ আমার হাতের উপর শুয়ে ডাক্তারের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। ডাক্তার কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না তারপর চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

আমি আবার মনে মনে বললাম, "হে ধরণী দ্বিধা হও।" ধরণী দ্বিধা হল না

তাই ডাক্তারকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে হল, "সিলভার নাইট্রেট দিয়ে মাছটা এঁকেছি। এরকম হবে বুঝতে পারি নাই।"

ডাক্তার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আপনি জানেন আপনি আগুন নিয়ে খেলছেন?"

কিছুদিন আগেই 'আগুন নিয়ে খেলা' নামে একটা সিনেমা রিলিজ হয়েছে, এই কথাটা এখন সবার মুখে মুখে তাই আমি মাথা নিচু করে ডাক্তারের বকুনি সহ্য করলাম। ডাক্তার বললেন, "খবরদার, ভবিষ্যতে কখনো এরকম পাগলামো করবেন না।"

আমি মাথা নাড়লাম, "করব না।"

"ইনফেকশন হয়ে আপনি শকে চলে যেতে পারতেন।"

আমি দুর্বলভাবে মাথা নাড়লাম। ডাক্তার ভদ্রলোক তখন আমার হাতে ওষুধপত্র লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করলেন। কিছু ইনজেকশন দিলেন। কিছু ট্যাবলেট দিলেন এবং আমাকে বললেন, "একটা পেথিড্রিন দিয়ে দিয়েছি, গিয়ে বিশ্রাম নেবেন।"

আমি তখনো পেথিড্রিন ইনজেকশনের নাম শুনি নি। এই ইনজেকশন দিয়ে যে রোগীদের ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয় আমি সেটাও জানি না। তাই মেডিকেল কলেজ থেকে সোজা কার্জন হলে ক্লাস করতে চলে এসেছি এবং কিছুক্ষণের মাঝেই দেখি চোখে ঘুম নেমে আসছে। ফিজিক্সের একটা ক্লাস ছিল, ক্লাসে গিয়ে আমার আর কিছু খেয়াল নেই। ক্লাস শেষ হবার পর আমার বন্ধুরা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল, আমি ঘুম ঘুম চোখে বললাম, "কী হয়েছে?"

"তুমি ক্লাসের মাঝে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছ।"

"ডাক্তার কী একটা ইনজেকশন দিয়েছে।" আমি জড়িত গলায় বললাম, "চোখ খোলা রাখতে পারছি না।"

"ক্লাসে ঘুমিয়ে কাজ নেই। হলে চলো।" কয়েকজন বন্ধু আমাকে টেনে তুলল। আমি তাদের হাত ধরে ঘুমে ঢলে পড়তে পড়তে হলে ফিরে চললাম। ঘুমের মাঝে হাঁটার মতো কঠিন কাজ আর কিছু নেই। কোনোমতে নিজের ঘরে এসে দড়াম করে বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলাম।

দুপুরে খাবার সময়ে তারা আমাকে ধরাধরি করে ডাইনিং রুমে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে আমি কী করেছি মনে নেই, আবার রুমে এসে বিছানায় শুয়ে ঘুম।

ঘুমের ধাক্কা কেটে যাবার পর আমি আবার আমার মাছের দিকে নজর দিলাম। জীবন্ত মাছ খুব ধীরে ধীরে শেষ পর্যন্ত মাছের আকৃতির একটা ক্ষতে রূপ নিল। দীর্ঘদিন সময় নিয়ে সেই ক্ষত সেরেছে। পুরো সময়টাতে হাতে ব্যান্ডেজ, যে–ই দেখে সে কারণটা জানতে চায়। কেউ কেউ দেখতেও চায়। যারা দেখে তারা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটা ছোট মাছের ছবি নিয়ে এত যন্ত্রণা হবে আমি ভুলেও কল্পনা করি নি।

মাছের গল্প ২

ডাইনিং হলে খেতে বসেছি। খাবারের আয়োজন খুবই খারাপ। ছোট পিরিচে সবজি নামে একধরনের ঘ্যাট, পাতলা জিলজিলে ডাল এবং ছোট বাটিতে শিং মাছ।

আমার পাশে যে খাচ্ছে হঠাৎ সে খাওয়া থামিয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, "কাণ্ডটা দেখেছ?"

আমি বললাম, "কী হয়েছে?"

"শিং মাছ দিয়েছে কিন্তু শিং মাছের গলা থেকে বড়শিটা পর্যন্ত খোলে নি!"

আমি তাকিয়ে দেখি সত্যিই তাই, শিং মাছের গলায় বড়শিটা লাগানো আছে। ছেলেটি খুব বিরক্ত হয়ে শিং মাছের মাথাটি ফেলে দিচ্ছিল আমি তাকে থামালাম। বললাম, "দাঁড়াও দাঁড়াও। আগেই ফেলো না।"

"কেন কী করবে?"

"দেখব।"

"কী দেখবে?"

আমি তার হাত থেকে শিং মাছের মাথাটা নিয়ে সাবধানে বড়শিটা খুলে বললাম, "শিং মাছ ধরার জন্য বড়শিতে কেঁচোকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। দেখতে চাচ্ছি কেঁচোটা আছে কি না।"

সবাই আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল, আমি বড়শিটা দেখালাম, সেখানে বেশ পুরুষ্টু একটা কেঁচো লাগানো। আমার পাশে বসে থাকা ছেলেটা খাবার প্লেট ঠেলে সরিয়ে মুখ বিকৃত করে উঠে দাঁড়াল, তার পক্ষে আর খাওয়া সম্ভব নয়।

আমি বসে খেতেই থাকলাম, তুচ্ছ এক টুকরো কেঁচো দেখে খাওয়া বন্ধ করলে কেমন করে হবে? আমরা হলে থাকি না!'

হাত দেখা

হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলার বিষয় বা পামিস্ট্রি নিয়ে আমার বাবার খুব উৎসাহ ছিল। সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি আমার বাবা হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। হাত দেখার জন্য তার একটা বিশাল ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছিল। ছোট থাকতে সেটা সূর্যের আলোতে ধরে আমরা পিঁপড়া পুড়িয়ে মারতাম!

হাত দেখা বা পামিস্ট্রি নিয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতাটা ছিল ভয়াবহ। আমি তখন খুবই ছোট—সংখ্যা বিষয়টা জানি না। ভাসা ভাসাভাবে জানি এক শ খুব বড়, কাজেই ধরে নিয়েছি এক শ ছাড়া অন্য সব সংখ্যা ছোট। একদিন আমার বাবা আমার হাত দেখে বললেন, "ইকবালের আয়ু আশি বৎসর!"

শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, মাত্র আশি বৎসর? আমার তাহলে কী হবে? মনের দুঃখে আমি কাতর হয়ে গেলাম। রাতে ঘুমানোর জন্যে শুয়েছি কিন্তু চোখে তো আর ঘুম আসে না। ছোট বলে বাবা আর মায়ের মাঝখানে শুয়েছি এবং শুয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদছি। কাঁদতে কাঁদতে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছি তখন হঠাৎ আমার মায়ের ঘুম ভাঙল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?"

আমি ডুকরে কেঁদে উঠে বললাম, "আমি নাকি মাত্র আশি বছর বাঁচব।"

আমার সেই ডুকরে কেঁদে ওঠায় অন্য সবারও ঘুম ভেঙেছে। বাবাও উঠেছেন, ডেকে আমাকে এক পাশে সরিয়ে নিলেন। কী হয়েছে জানতে চাইলেন, আমি একেবারে আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম," আমি যে মাত্র আশি বছর বাঁচব!"

ছোট ছিলাম বলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে তার হাসি চেপে রাখার ভঙ্গিটি দেখার কথা মাথায় আসে নি! বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কে বলেছে তুই আশি বছর বাঁচবি? তুই এক শ বছর বাঁচবি।"

এক শ বছর শুনেই আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। এক শ আমার কাছে বিশাল একটা সংখ্যা! এক শ বছর বেঁচে থাকা আমার কাছে অনন্ত কাল বেঁচে থাকা—কাজেই মুহূর্তে আমার বুক থেকে দুঃখ কষ্ট আতংক ভয় উদ্বেগ সবকিছু দূর হয়ে গেল। আগে কেন আশি বলেছিলেন এখন কেন এক শ বলছেন এই ধরনের কোনো প্রশ্নই আমার মাথায় উঁকি দিল না। আমি সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে সুখী মানুষ হিসেবে ঘুমাতে গেলাম!

আমরা যখন রাঙামাটি থাকি তখন একদিন আমার বাবা অফিস থেকে এসেছেন, আমার মা জিজ্ঞেস করলেন, "চিঠিপত্র কিছু এসেছে?"

বাবা বললেন, "চিঠি নাই, পত্র আছে।"

মা অবাক হয়ে বললেন, "তার মানে কী?"

বাবা পকেট থেকে একটা লম্বা খাম বের করলেন তার ভেতরে ভাঁজ করা কাগজ। সেই কাগজ খুলে দেখা গেল সেখানে কোনো একজন মানুষের হাতের ছাপ। খুন করেছে বা আত্মহত্যা করেছে এরকম বিশেষ কোনো চরিত্রের একজন মানুষের হাতের ছাপ কেমন হয় দেখার জন্য অনেক খুঁজে বাবা সেই ছাপ যোগাড় করেছেন। মা আপনজনের কাছ থেকে আসা সত্যিকার চিঠির জন্য অপেক্ষা করেন, তাই সেই বিদঘুটে হাতের ছাপ দেখে খুব বিরক্ত হলেন! বাবার উৎসাহের শেষ নাই, গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই হাতের ছাপ পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন!

বাসায় হাত দেখার নানা রকম বই। কাজেই আমরা যখন বড় হতে শুরু করলাম সেই বইগুলো পড়ে পড়ে ভাইবোন সবাই ছোট বড় এবং মাঝারি পামিস্ট হিসেবে বড় হতে শুরু করেছি। বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা হলেই হাতটা এক নজর দেখে বলি, 'ছেলেবেলায় কঠিন ফাঁড়া কেটেছে' 'বিদেশ ভ্রমণ অবধারিত' 'বড়লোকের মেয়ের সাথে বিয়ে হবে' কিংবা 'খবরদার, পানি থেকে সাবধান।'

হাত দেখার এই বিদ্যাটি চমকপ্রদ। আমি যদি একজনের হাত দেখে বলি, "তোমার খুব মনের জোর" তাহলে সাথে সাথে সে মাথা নাড়বে এবং তার জীবনের নানা ঘটনায় যেখানে যেখানে মনের জোর প্রকাশ করেছে সেটা মনে করতে থাকবে। যদি তাকে বলি, "তোমার মনের জোর কম" তাহলে সাথে সাথে সে দুর্বল হয়ে যাবে এবং জীবনের নানা ঘটনায় মনের জোর না দেখানোর কারণে তার যে দুর্গতি হয়েছে সেটা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। কাজেই জ্যোতিষিবিদ্যায় কারো ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং আমি আবিষ্কার করলাম কলেজে পড়ার সময়েই আমার জ্যোতিষি হিসেবে নামডাক হয়ে গেছে। আমি তখন ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ি, সাউথ হোস্টেলে থাকি। একদিন আমাদের ব্লকের কেয়ারটেকার আমার কাছে এসে অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে তার হাতটি বাড়িয়ে দিল; তার ভবিষ্যৎ বলে দিতে হবে। আমি তার হাত দেখে গম্ভীর গলায় বললাম, "তোমার স্ত্রী তো অসুস্থ! তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।"

আমার কথা শুনে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে কাঁপা গলায় বলল, "আপনি কেমন করে জানলেন?"

আমি আমার মুখে জ্যোতিষিসুলভ গাম্ভীর্য ধারণ করলাম। কেয়ারটেকার গলা নামিয়ে বলল, "আসলে আমার বউকে জীনে ধরেছে।"

এবারে আমার চমকে ওঠার পালা। বললাম, "জীন?"

"হ্যাঁ। জীন। যন্ত্রণায় অস্থির।"

যাই হোক আমি তার হাত দেখে ভালো-মন্দ কিছু বলে বিদায় করে দিলাম। কিছুদিন পর হঠাৎ করে সে আবার এসে হাজির হল, চোখেমুখে বিচলিত ভাব। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"স্ত্রীকে নিয়ে খুব সমস্যা। আপনি বাঁচান।"

"আমি বাঁচাব?"

"হ্যাঁ। একটা তাবিজ দেন।"

আমি চমকে উঠলাম, এর আগে আমাকে কেউ কখনো তাবিজ দিতে বলে নি। আমি বাবার বইপত্র পড়ে হাত দেখা শিখেছি কিন্তু তাবিজ দেওয়া শিখি নি। কাজেই অনেক কষ্ট করে কেয়ারটেকারকে বিদায় করলাম। সঠিক তাবিজ

যোগাড় করে সে জীনের হাত থেকে তার স্ত্রীকে কখনো মুক্ত করতে পেরেছিল কি না জানা হয় নি।

জ্যোতিষিবিদ্যায় আমি যখন মোটামুটি বিখ্যাত হয়ে গেছি তখন একদিন আমার একটা বড় পরীক্ষা হয়েছিল। আমার বাবা একদিন আমাকে ডেকে বললেন, "ইকবাল, বাবা আমার হাতটা দেখে দে দেখি।"

আমি একটু ইতস্তত করে আমার বাবার হাতটা হাতে নিয়ে চমকে উঠলাম। পামিস্ট্রির সকল বইয়েই অস্বাভাবিক মৃত্যু বা ডেথ বাই ভায়োলেন্সের একটা চিহ্ন থাকে। আমি শুধু বইপত্রে তার ছবি দেখেছি, কোনো মানুষের হাতে সেটা আগে কখনো দেখি নি। বাবার হাতে সেই সুস্পষ্ট চিহ্ন। আমি ইতস্তত করে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী চিহ্ন?"

বাবা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বললেন, "এটা কিছু নয়।"

আমি বাবার হাত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, জ্যোতিষিবিদ্যা অনুযায়ী সেটি ছিল একজন অত্যন্ত রুচিবান শিল্পীর হাত। পুলিশে চাকরি করলেও আমার বাবা ছিলেন একেবারে সত্যিকারের রুচিবান মানুষ। যাই হোক তার কিছুদিন পরেই একাত্তর এসে আমাদের সবার জীবনকে তছনছ করে দিল। বাবা তার হাতের ডেথ বাই ভায়োলেন্সের চিহ্নটি নিয়ে পাকিস্তান মিলিটারির গুলি খেয়ে মারা গেলেন।

হাতের রেখায় এরকম ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা দেখে আমি প্রথম প্রথম খুব অবাক হয়েছিলাম। এর পর আমি এক ধরনের অসুস্থ কৌতূহল নিয়ে অস্বাভাবিকভাবে মারা যাওয়া মানুষের হাত দেখে বেড়াতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মর্গেও গিয়ে দেখেছি, গুলি খেয়ে মারা যাওয়া সেইসব মানুষের হাতে কিন্তু সেই চিহ্নগুলো খুঁজে পাই নি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, একটা ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না থাকলে সেটা গ্রহণ করতে পারি না। তাই ধরে নিয়েছি বাবার হাতের সেই চিহ্ন এবং গুলি খেয়ে মারা যাবার ঘটনাটি ছিল একটা কাকতালীয় ঘটনা। এর মাঝে কোনো যোগসূত্র নেই।

যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে যেতে আমার জ্যোতিষী ক্ষমতার কথা মোটামুটিভাবে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমার বড় বোন শেফুর বড় মেয়েটির জন্ম হয়েছে হাসপাতালে, সিজারিয়ান করে তার জন্ম হয়েছে। আমি

হাসপাতালে গিয়ে দেখি সকল নার্স আমাকে হাত দেখানোর জন্য অপেক্ষা করছে! আমার বোনকে যখন অপারেশন করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে তখন সে চিঁ চিঁ করে ডাক্তারকে বলেছে, "আমি আগেই জানতাম আমার নরমাল ডেলিভারি হবে না। সিজারিয়ান লাগবে।"

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন, "আপনি কেমন করে জানতেন?"

বোন বলল, "আমার ছোট ভাই হাত দেখে—সে হাত দেখে বলেছে।"

সেই খবর হাসপাতালে ছড়িয়ে গেছে এবং হাসপাতালের সব নার্স আমাকে তাদের হাত দেখানোর জন্য অপেক্ষা করছে। এই ব্যাপারটা একটু কঠিন। হাত দেখার পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে এক ধরনের তামাশা। যারা আমার কাছে দেখাতে আসে তারাও সেটা জানে এবং আমিও সেটা জানি। যারা আসে তাদের সবারই প্রশ্ন ঘুরেফিরে প্রেম ভালবাসা বিবাহ এবং বিদেশ ভ্রমণের মাঝে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই নার্সেরা অপেক্ষা করছে তাদের জীবনের অনেক বড় এবং কঠিন সমস্যা নিয়ে। তাদের হাত দেখে কিছু একটা বলা খুব কঠিন, তারপরেও বলেছি এবং তখন আমার নিজেকে বড় একজন প্রতারক এবং ভণ্ড বলে মনে হয়েছে!

সেই হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি খুব নিরাপদ জায়গা। প্রথমে নিজের ক্লাসের ছেলে এবং মেয়েদের হাত দেখতে হয়েছে। তারপর নিজের বিভাগের অন্যান্য ক্লাসের ছেলে এবং মেয়েদের। তারপর অন্যান্য বিভাগের এবং ধীরে ধীরে আমার সুনাম কার্জন হল থেকে আর্টস বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমি তখন আমার হাত দেখার জন্যে একটা ফি নির্ধারণ করে দিলাম। এক প্যাকেট গোল্ড ফ্ল্যাক সিগারেট। যারা হাত দেখাতে আসে এই ফি দিতে তাদের কোনো কার্পণ্য নেই এবং আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে চুটিয়ে দামি সিগারেট খেতে লাগলাম।

ঠিক কী কারণ জানা নেই হাত দেখাতে ছেলে থেকে মেয়েদের উৎসাহ অনেক বেশি—স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমার নিজেরও তাদের হাত দেখতে উৎসাহ অনেক বেশি! যে সুন্দরী মেয়েটির সাথে এমনিতে ভদ্রতার কথা বলারও সুযোগ নেই, হাত দেখার নাম করে দীর্ঘ সময় তার হাত ধরে বসে থাকা যায় এই বিষয়টিও তখন আমি আবিষ্কার করতে শুরু করেছি।

আমাদের ক্লাসের প্রায় সব মেয়েই আমাকে তার হাত দেখিয়েছে, একটি মেয়ে বাকি ছিল। তার নাম ইয়াসমীন হক। ক্লাসের সবচেয়ে চটপটে আধুনিকা মেয়ে। একদিন সেও গোল্ড ফ্ল্যাক প্যাকেট নিয়ে হাজির হল। আমি তার হাত ধরে টিপেটুপে দেখে গভীর মনোযোগ নিয়ে পরীক্ষা করে বললাম, "তোমার বিয়ে হবে খুব বড়লোক একজন মানুষের সাথে।" এক প্যাকেট গোল্ড ফ্ল্যাক সিগারেট নিয়ে শুধু এইটুকু বলে গেলে হয় না। আরো অনেক কিছু বলতে হয়। তাই আমি আরো অনেক কিছু বলেছিলাম এখন সেগুলো মনে নেই। তবে বিবাহ সংক্রান্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার খুব ভালো করে মনে আছে, কারণ হাত দেখার এই ঘটনার কয়েক বছর পর এই মেয়েটির সাথেই আমার বিয়ে হয়েছিল। নববধূ হিসেবে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করার পর যখন আমাকে একলা পেয়েছিল তখন কোনো রোমান্টিক মধুর কথা না বলে ইয়াসমীন হক আমার বুকের কাপড় ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কী সাহেব? আমার নাকি খুব বড়লোকের সাথে বিয়ে হবে?"

আমি বিয়ে করার খরচ সামলানোর জন্য ইয়াসমীন হকের কাছ থেকেই কিছু টাকা ধার করেছি, নিজেকে আর যাই দাবি করি না কেন বড়লোক হিসেবে দাবি করতে পারি না। আমতা আমতা করে বললাম, "না, মানে ইয়ে–বড়লোক শুধু কি টাকা–পয়সা দিয়ে হয়! একজন মানুষ তো তার মন দিয়েও বড় হয়। হৃদয় দিয়ে বড় হয়—বুদ্ধি মেধা কিংবা মনন দিয়ে বড় হয়—"

বলা বাহুল্য আমি আমার এই যুক্তি খুব বেশি দূর নিয়ে যেতে পারি নি। বিয়ের একেবারে প্রথম রাত বলে ইয়াসমীন হক আমাকে মাপ করে দিয়েছিল!

খুব সংগত কারণেই এর কিছুদিনের ভিতরেই আমি হাত দেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম!

নাটক

আমরা কিছু বন্ধুবান্ধব বসে কথা বলছি। বক্তব্য মোটামুটি গুরুতর। আমি বললাম, "আমরা পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। আমাদের আসলে এই বিষয়টার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।"

উপস্থিত কয়েকজন মাথা নাড়ল, "ঠিকই বলেছ।"

আমি বললাম, "পদার্থবিজ্ঞান সোসাইটির প্রথম দায়িত্ব হবে পদার্থবিজ্ঞান। শেষ দায়িত্বও হবে পদার্থবিজ্ঞান।"

অন্যেরা আবার মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "কিন্তু আমাদের সোসাইটি কী করছে দেখেছ? শুধু গানবাজনা করে। শুধু কালচারাল ফাংশন।"

আরেকজন মনে করিয়ে দিল, "আর নাটক।"

"হ্যাঁ, আর নাটক।"

স্বাধীনতার পর টি. এস. সি-তে প্রথম যে নাটকটা মঞ্চস্থ করা হয়েছিল সেটা আমাদের বিভাগের একটা নাটক ছিল। বিষয়টা নিয়ে গর্ব করা যায় সেটা আমাদের মাথাতেই এল না। আমি নিজে সেই নাটকে অভিনয় করেছি এবং আমার ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ সেইটাও আমার মনে পড়ল না। আমি গরম হয়ে বললাম, "এসব বন্ধ করতে হবে।"

অন্যেরা মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "আমাদের প্রধান দায়িত্ব হবে লেখাপড়া। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া। এইসব নাটক-ফাটক তুলে দিয়ে আমাদের পড়ালেখায় মনোযোগী হতে হবে।"

কাজেই আমরা কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের বিভাগের

পদার্থবিজ্ঞান সোসাইটিতে আমরা একটা প্যানেল দিয়ে ইলেকশন করব। সেই ইলেকশনে জিতে এসে আমরা আমাদের বিভাগ থেকে নাটক–ফাটক তুলে দিয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনব।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি অনেক বড় বড় ছাত্র সংগঠনকে হারিয়ে আমাদের প্রায় পুরো প্যানেল ইলেকশনে জিতে গেল, শুধু একজন হেরেছে, এ ছাড়া সব আমাদের। বড় বড় ছাত্র সংগঠন একেবারে হকচকিয়ে গেল—এটা কেমন করে সম্ভব।

ইলেকশনের পর সোসাইটির সকল নির্বাচিত সদস্য বসেছি। সিনিয়রদের সামনে পরীক্ষা, তারা কেউ নেই কাজেই দায়দায়িত্ব পড়েছে আমাদের ঘাড়ে। আমি বললাম, "এরকম সাংঘাতিক ভাবে ইলেকশনে জিতে এসেছি আমাদের সেটা হইচই করে উদযাপন করা দরকার।"

অন্যেরা মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "খুব বড় একটা অনুষ্ঠান করতে হবে। সবার যেন তাক লেগে যায়।"

সবাই আবার মাথা নাড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সেটা কীভাবে করা যায়?"

একজন বলল, "একটা নাটক করলে কেমন হয়?"

আমাদের সবার চোখ চকচক করে উঠল, আমরা জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, বললাম, "ঠিকই বলেছ! আমাদের একটা অসাধারণ নাটক করতে হবে।"

"কী নাটক করা যায়?"

আমি বললাম, "তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি নাটক লিখে ফেলব।"

কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করল, "তুমি পারবে?"

"এক শ বার পারব।"

নাটক করার অপরাধে আগের সোসাইটিকে নির্বাচনে হারিয়ে আমরা জিতে এসে প্রথম কাজ হিসেবে এই ডিপার্টমেন্ট আবার নাটক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পুরো ব্যাপারটা যে তামাশার মতো মনে হতে পারে সেটা আমাদের কারো মাথায় এল না!

কাজেই বিখ্যাত সোভিয়েত সায়েন্স ফিকশান থেকে আনাতোলী দনিপ্রভের গল্প 'ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ' অবলম্বনে আমি একটা নাটক লিখে ফেললাম। মাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের রাগ পাকিস্তানি মিলিটারিদের ওপর। তাই কাহিনীটিতে যত খারাপ মানুষ সবাইকে পাকিস্তানি মিলিটারিদের সাথে যোগ করে দিয়েছি। সায়েন্স ফিকশানের উপযোগী স্টেজে বিশাল ল্যাবরেটরির সেট তৈরি করতে হয়েছে। কুটিল বিজ্ঞানীর প্রহরীর জন্য আমি একটা স্টেনগান তৈরি করে দিয়েছি সত্যিকার স্টেনগান থেকে সেটা কোনো অংশে কম না।

নির্দিষ্ট দিনে সেই নাটক মঞ্চস্থ হল, দর্শক সেই নাটক দেখে একেবারে থ হয়ে গেল। মঞ্চে প্রেম ভালবাসা দেখেছে, দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা দেখেছে, হাস্য কৌতুক দেখেছে, কিন্তু তাই বলে সায়েন্স ফিকশান? সেটা এর আগে কেউ দেখে নি। নাটক শেষে যখন পর্দা নেমেছে দর্শকদের হাততালি আর থামতে চায় না। গর্বে আমাদের বুক এক শ হাত ফুলে গেল!

নাটক শেষে আমাদের মেয়ে চরিত্রটি এসে বলল, "আমাকে স্টেনগানটি দেবেন, প্লিজ!"

আমি বললাম, "নিয়ে যাও।"

মাস কয়েক পরে রক্ষীবাহিনী সব হলে হলে অবৈধ অস্ত্রের খোঁজ করেছিল। মেয়েদের হলও বাদ দেয় নি। সেই স্টেনগান নিয়ে তখন মেয়েগুলো যা বিপদে পড়েছিল সেটা বলার নয়। হতে পারে সেটা কাঠের তৈরি কিন্তু স্টেনগান তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

কখন বিপদ কোনদিক দিয়ে আসে কেউ আগে থেকে বলতে পারে না।

রক্ষীবাহিনী

আমরা ঘরের ভেতর বসে আছি। দরজায় দুম দুম বুটের লাথির আওয়াজ। রক্ষীবাহিনী এসেছে আমাদের বাসা থেকে উৎখাত করতে। কী করব আমরা বুঝতে পারছি না এক ধরনের আতংক নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছি। কাঠের দরজায় এখন বেয়নেট দিয়ে আঘাত করছে—আমরা দেখতে পাচ্ছি বেয়নেটের ফলা দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে দরজা ভেঙে গেল, লাথি মেরে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকল জলপাই রঙের পোশাক পরা অনেকগুলো রক্ষীবাহিনীর সিপাই। তারা তাদের আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আমাদের বুকের দিকে তাক করে ধরে অশ্রাব্য ভাষায় কিছু একটা বলছে। আমার মা কোথা থেকে ছুটে এসে রক্ষীবাহিনীর অস্ত্র আর আমার মাঝখানে দাঁড়িয়ে খপ করে আমার হাত ধরে বললেন, "একটা কথা বলবি না। চুপ করে থাক।"

তারপর আমাদের টেনে ঘর থেকে বের করে আনলেন। আমরা বের হওয়া মাত্রই রক্ষীবাহিনীর এক ধরনের উল্লাসের শব্দ শোনা গেল। তারা টেনে টেনে আমাদের ঘরের আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল বাসনকোসন জামাকাপড় বইপত্র রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে লাগল। কিছুক্ষণের মাঝেই আমাদের বাসার সব জিনিসপত্র রাস্তার মাঝে স্তূপ হয়ে গেল। আশেপাশে কেউ নেই, সবাই তাদের বাসার ভেতর থেকে জানালা দিয়ে দেখছে কিংবা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। রক্ষীবাহিনীকে সবাই খুব ভয় পায়।

রাস্তার মাঝখানে ডাইনিং টেবিলটা কাত হয়ে পড়ে ছিল। সেটাকে সোজা করে চেয়ারগুলো কাছে টেনে আনলাম। রাস্তার ঠিক মাঝখানে সেই চেয়ারে

পরিবারের সবাই বসেছি। একজন আরেকজনের দিকে তাকাই, কী বলব বুঝতে পারি না। আশপাশে কেউ নেই, সবাই জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছে, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ একটা পরিবারকে সরকার থাকার জন্য একটা বাসা রীতিমতো লিখে পড়ে দিয়েছিল রক্ষীবাহিনীর সশস্ত্র লোকজন এসে তাদের সেই বাসা থেকে বের করে দিয়েছে।

আমাদের নিশ্চয়ই খুব অপমান বোধ করার কথা ছিল, লজ্জা পাবার কথা ছিল, কিন্তু ঠিক কী কারণ জানা নেই আমাদের সেরকম লজ্জা লাগছে না, অপমান বোধও হচ্ছে না। আমরা রাস্তার মাঝখানে চেয়ার টেবিল পেতে বসে আছি। মাথার ওপর কোনো আশ্রয় নেই—তখন তাই ভেবেছিলাম। আসলে মাথার ওপর আশ্রয় ছিল আকাশ। একবার আকাশের আশ্রয়ে বেঁচে থাকা শিখে গেলে আর কিছু লাগে না।

স্বাধীনতার পর সেই ভয়াবহ দুঃসময়ে আমরা টিকে গিয়েছিলাম শুধু এই একটি কারণে! মাথার ওপরে আকাশের যে আশ্রয় সেটা কেউ কেড়ে নিতে পারে না!

চোর ১

সবুজ ভাই আমাদের থেকে দুই ক্লাস উপরে পড়েন, ফজলুল হক হলের তিন তলায় থাকেন। কীভাবে কীভাবে জানি আমার সাথে পরিচয় হয়েছে, দেখা হলে আমার খোঁজখবর নেন। কথাবার্তায় একটু বড়ভাইসুলভ ভাব আছে, সেটা সহ্য করতে হয়।

একদিন কার্জন হল থেকে ক্লাস করে হলে ফিরে আসছি তখন শুনতে পেলাম ঘড়ি চুরি করতে গিয়ে একজন ধরা পড়েছে, তাকে হলের গেটের ছোট ঘরটাতে বেঁধে রাখা হয়েছে। চোর দেখার এক ধরনের কৌতূহল আছে, আমি হল গেটের ছোট দরজাটা ফাঁক করে ভেতরে তাকালাম। ঘরের ভেতরে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা অবস্থায় সবুজ ভাই বসে আছেন, চোখে-মুখে প্রচণ্ড মারের চিহ্ন। আমাকে দেখে সবুজ ভাই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালেন, চোখের দৃষ্টি ভাবলেশহীন উদাস।

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। গেটে দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, সে আমাকে খবর দিল তিন তলায় একজন কার ঘড়ি হারিয়েছে, ঠিক কী কারণ জানি না যার ঘড়ি হারিয়েছে সে সরাসরি সবুজ ভাইকে সন্দেহ করে বসল। সবুজ ভাই অস্বীকার করলেন এবং ঘড়ির মালিক তখন তাকে পেটাতে শুরু করল। ভয়াবহ অবস্থা, শুধুমাত্র সন্দেহ করে একজন আরেকজনকে পেটাতে পারে কারো জানা ছিল না কিন্তু তাই ঘটল। হলের অন্য সব ছেলেদের ভিড় জমে গেল এবং দেখা গেল একজন ষণ্ডাগোছের ছাত্র সবুজ ভাইকে নির্দয়ভাবে মারছে। সবুজ ভাই মার খেতে খেতে কাতর গলায় বলছেন তিনি চুরি করেন নাই।

যখন সবাই মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়ে গেল যে আসলে কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, সবুজ ভাই চুরি করেন নাই এবং ষণ্ডাগোছের ছেলেই অকারণে সবুজ ভাইকে পিটাচ্ছে তখন হঠাৎ করে সবুজ ভাই আর সহ্য করতে পারলেন না, হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে স্বীকার করলেন যে তিনি আসলে চুরি করেছেন। পিটুনিতে একটা বিরতি দেওয়া হল এবং সবুজ ভাই বাথরুমে গিয়ে জানালায় হাত দিয়ে বাইরে কোথাও লুকিয়ে রাখা ঘড়িটা বের করে দিলেন।

পাশাপাশি রুমে থাকা একজন সহপাঠী যখন হঠাৎ করে 'চোর' বের হয়ে যায়, এবং যখন তাকে রাস্তায় ধরা পড়া ছিনতাইকারী বা পকেটমারদের মতো পেটানো যায় তখন পুরো ব্যাপারটাকেই কেমন জানি পরাবাস্তব বলে মনে হয়।

জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমি ভুলে গেছি কিন্তু এই ঘটনাটা আমি কেন জানি ভুলতে পারি না।

চোর ২

বড় বোন শেফুর ফুটফুটে একটা বাচ্চা হয়েছে, মায়াকাড়া চেহারা কিন্তু তার নাকটা বাঁকা, মনে হয় কেউ ঘুসি মেরে বাঁকা করে দিয়েছে। ডাক্তার অবিশ্যি সেই বাঁকা নাক নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন নন, বললেন সোজা হয়ে যাবে। দুধের বাচ্চা—সবাই তার নাক সোজা করার জন্য টানাটানি করতে লাগল এবং সত্যি সত্যি সেটা সোজা হয়ে গেল। (আমার ধারণা ছেলেবেলায় তার নাক ধরে বেশি টানাটানি করা হয়েছিল বলে এখন তার নাক সবার চাইতে খাড়া।) বাসায় বহুদিন পরে একটা ছোট বাচ্চা এসেছে। ছোট বাচ্চা যে এত মজার একটা বিষয় হতে পারে আমাদের সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। আমরা সবাই ছোট বাচ্চাটাকে হাতে নেওয়ার জন্য বড় বোনের পিছনে ঘুরোঘুরি করি। বাচ্চার বাবা তখন জেলে, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর যারা রাজনীতি করে তাদের প্রায় সবাইকে সরকার জেলে ঢুকিয়ে রেখেছে। একাত্তরে যারা দেশ স্বাধীন করেছে পঁচাত্তরে তারা সবাই দেশের শত্রু—তাদের জেলে আটকে রাখতে হয়।

ছোট বাচ্চার অনেক কাজ, বেশির ভাগই মাকে করতে হয়। তাই গভীর রাতে বড় বোন উঠে ঘুমঘুম চোখে ছোট বাচ্চার জন্য দুধ তৈরি করে তাকে খাওয়ায়। একদিন সেভাবে ঘুম থেকে উঠেছে এবং ঠিক কী কারণ জানা নেই তার এক ধরনের অস্বস্তি হতে থাকে, মনে হতে থাকে কেউ একজন তাকে চোখে চোখে অনুসরণ করছে। সে তার কাজকর্ম শেষ করে তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে বুকে চেপে শুয়ে পড়ল।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলাম রাতে চোর এসেছিল। গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে নেবার মতো যা কিছু ছিল সব নিয়ে গেছে। একাত্তর সালে

আমাদের সাজানো-গোছানো বাসার সবকিছু পাকিস্তান মিলিটারি লুট করে নিয়েছিল। যেটুকু তারা নিতে পারে নিয়েছে বাকিটুকু অন্যদের দিয়ে লুট করেছে। সেই থেকে আমাদের জীবনটা হয়ে গেছে পিকনিকের মতো, বেঁচে থাকতে হলে যে নানা ধরনের জিনিসপত্র থাকতে হয় সেটাই আমরা ভুলে গেছি। জিনিসপত্রের জন্যে মায়াও চলে গেছে, সবার ভিতরে এক ধরনের দার্শনিক ভাব।

আমার বোনের বিয়ের দুই একটা শাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই, সকালে তাই সে সেই বিয়ের শাড়ি পরে ঘুরতে লাগল, তার কারণে বাসায় একটা উৎসবের আবহাওয়া চলে এসেছে। সেই তুলনায় আমাদের ভাইদের অবস্থা খারাপ, আমাদের কিছুই নেই। অনেক খুঁজেপেতে একটা শার্ট পাওয়া গেছে। বাইরে বের হতে হলে সেই একমাত্র শার্ট পরে বের হতে হয়। তাই একজন যখন বের হয় অন্য দুজনকে তখন বাসায় বসে থাকতে হয়। চট করে বের হয়ে যে কিছু জামা-কাপড় কিনে আনা হবে সেরকম পরিস্থিতিও নেই। সেই সময় দেশে কাপড়-জামার খুব অভাব। কিছুদিন আগে হলের ছাত্রদের কাছে 'প্যান্টপিস' বিক্রি করা হয়েছে, আগে আসলে আগে পাবে ভিত্তিতে জনপ্রতি একটা করে প্যান্ট পিস। আমি অনেক হুড়োহুড়ি করে সেটা কিনে বড় ভাইকে দিয়েছি। সে তখন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে তার ভদ্র জামা-কাপড়ের দরকার আমার থেকে বেশি।

সেই সময়ে আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী পাশের বাসার ডাক্তার সাহেব আর তার পরিবার। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী চুরির খবর শুনে বললেন, "এক্ষুনি কেউ একজন ঢাকা কলেজের সামনে চলে যাও। রাতে যেগুলো চুরি হয় সকালে সেগুলো বিক্রি হয়। কম দামে কিনে আনতে পারবে!"

কোনো লাভ হবে না জেনেও সকালবেলা এক চক্কর ঘুরে আসা হল। প্রচুর জামা-কাপড় বিক্রি হচ্ছে কিন্তু সেখানে আমাদের জামা-কাপড় খুঁজে পাওয়া গেল না। চোর নিশ্চয়ই বিক্রি করার জন্য অন্য কোনো জায়গা বেছে নিয়েছে!

আমরা সেই সময়ে সব বিপদ আপদ কষ্ট যন্ত্রণার মাঝেই ভালো কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম। এখানেও তার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। চোর চুরি করে বাসা খালি করে ফেললেও তার স্পঞ্জের স্যান্ডেল জোড়া ভুল করে ফেলে গেছে। সেটাই লাভ—আমাদের পায়ে দিব্যি ফিট হয়, সেটা পরে আমি ঘুরে বেড়াই।

গরু মেরে জুতো দান শুনেছি, স্যান্ডেল দান নিজ চোখে দেখলাম।

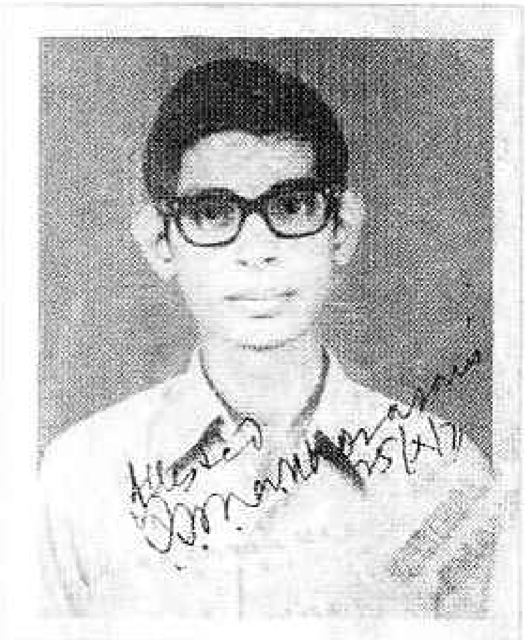

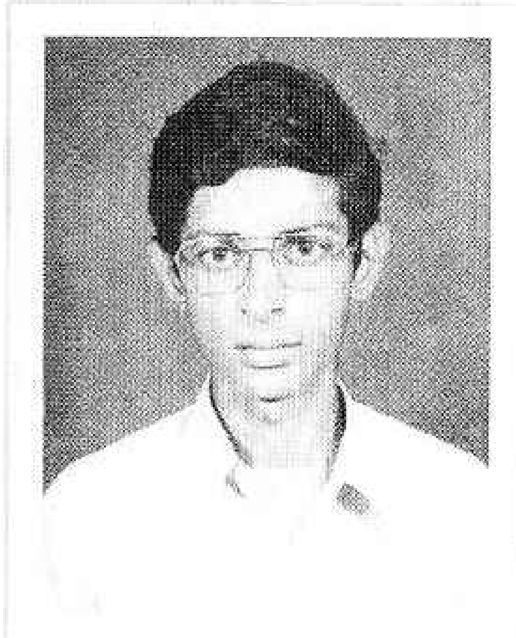

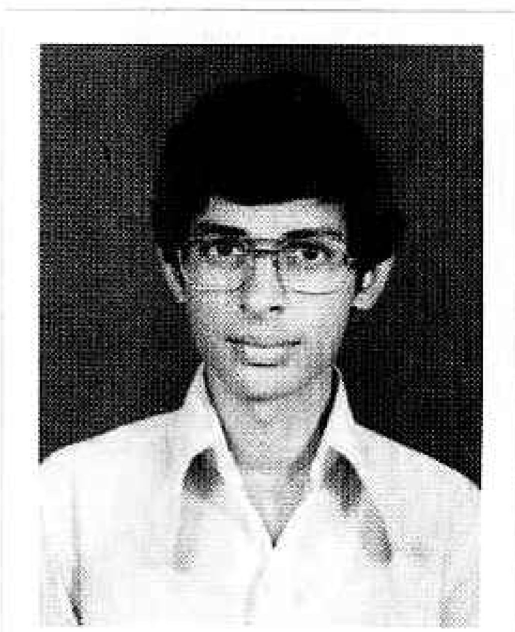

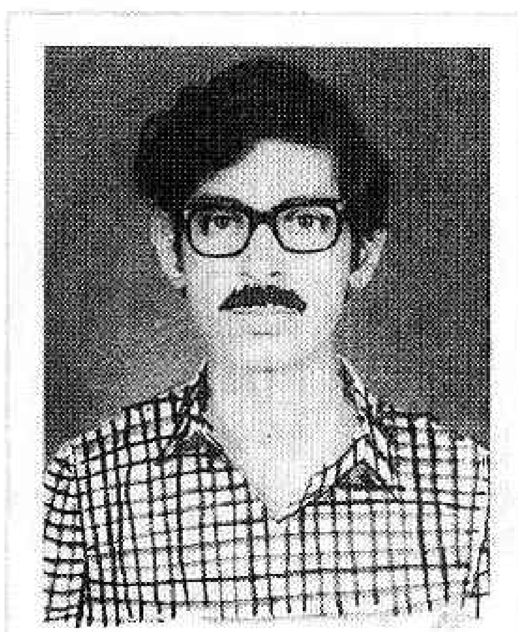

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি। শেষ ছবিটাতে গোঁফ এবং শার্টের চেক কলম দিয়ে আঁকা। গোঁফ রাখলে দেখতে কেমন লাগবে এই ছবিটাতে সেটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল!

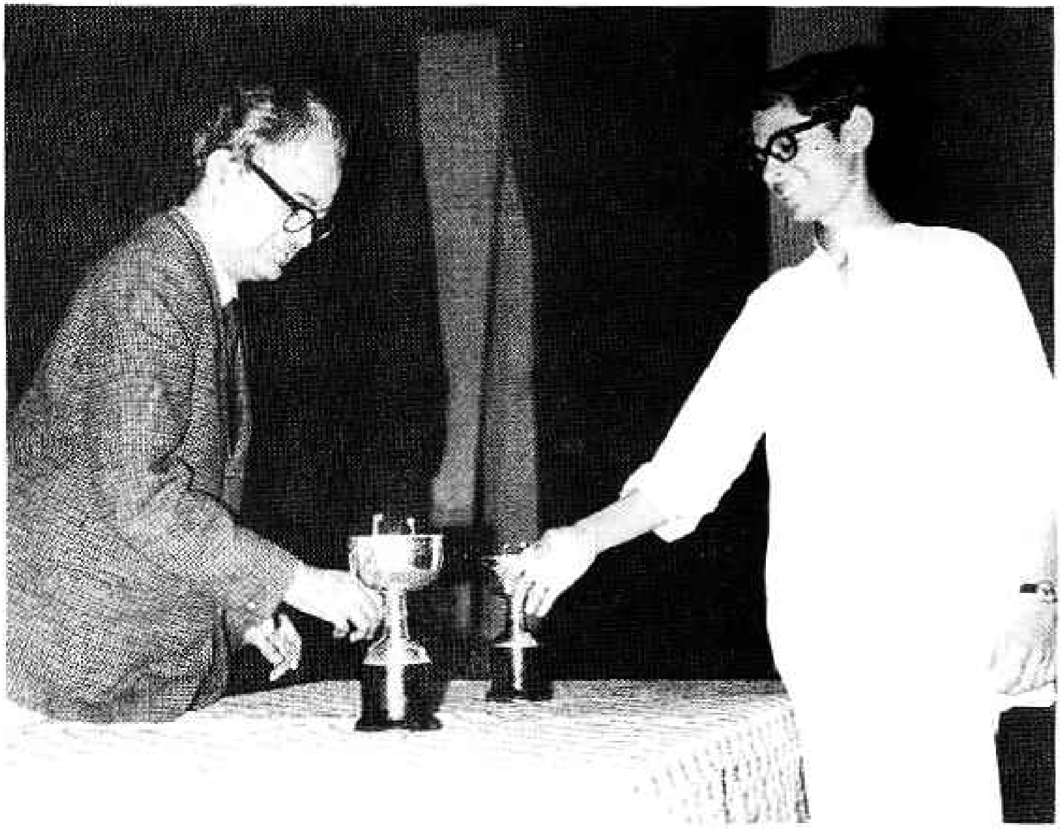

টি. এস. সি. তে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার নিচ্ছি।
পুরস্কার পাবার আনন্দে মুখে এগাল–ওগাল জোড়া হাসি!

মায়ের সঙ্গে ছয় ভাই–বোন। বাবর রোডে তোলা ছবি, এই বাসা থেকে রক্ষীবাহিনী
আমাদের পরিবারকে বের করে দিয়েছিল।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহপাঠিনীদের সাথে আমরা—আমি বসে আছি, ডান দিক থেকে দুই নম্বর।
আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন সব মেয়েরা শাড়ি পরে ক্যাম্পাসে আসত!

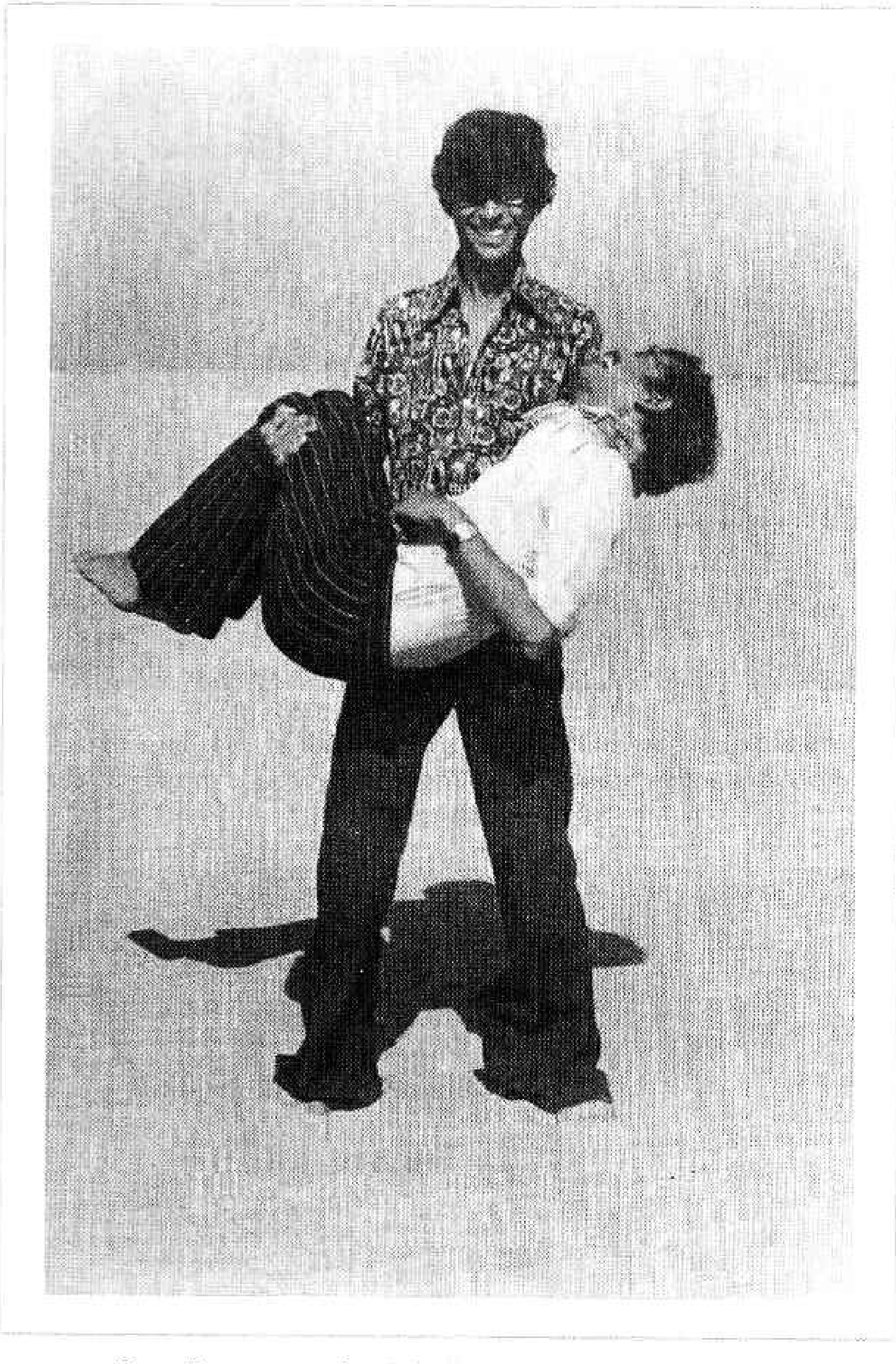

বন্ধু মোত্তালিবকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে দাঁড়িয়েছি ক্যামেরার সামনে। কেন? কারণ জানা নেই!

কক্সবাজারের বালুবেলায় দুই বন্ধুর পুরো শরীর বালুতে গেঁথে শুধু মাথাটি বের করে রেখেছি!
কী কারণ, কে বলবে? আমি ডান পাশে।

বালুবেলায় ডিপার্টমেন্টের নাম, পিছনে দাঁড়িয়েছি নয় জন।
আমি ডানদিক থেকে দ্বিতীয়— স্বাস্থ্য লক্ষণীয়!

একজন জিজ্ঞেস করল চ্যাংদোলা মানে কী? তাকে হাতে-কলমে দেখানোর জন্যে সাথে সাথে একজনকে চ্যাংদোলা করে পানিতে ছুড়ে দেওয়া হল। আমি ডানপাশে, বামের মেয়েটির নাম পান্না। খুব অল্প বয়সে ক্যান্সারে মারা গিয়েছিল সে।

সবারই তখন ভালবাসার মানুষ আছে, আমার নেই! তাই বালু দিয়ে তৈরি একটি মেয়ের পাশে আমি বসেছি রোমান্টিক ভঙ্গিতে!

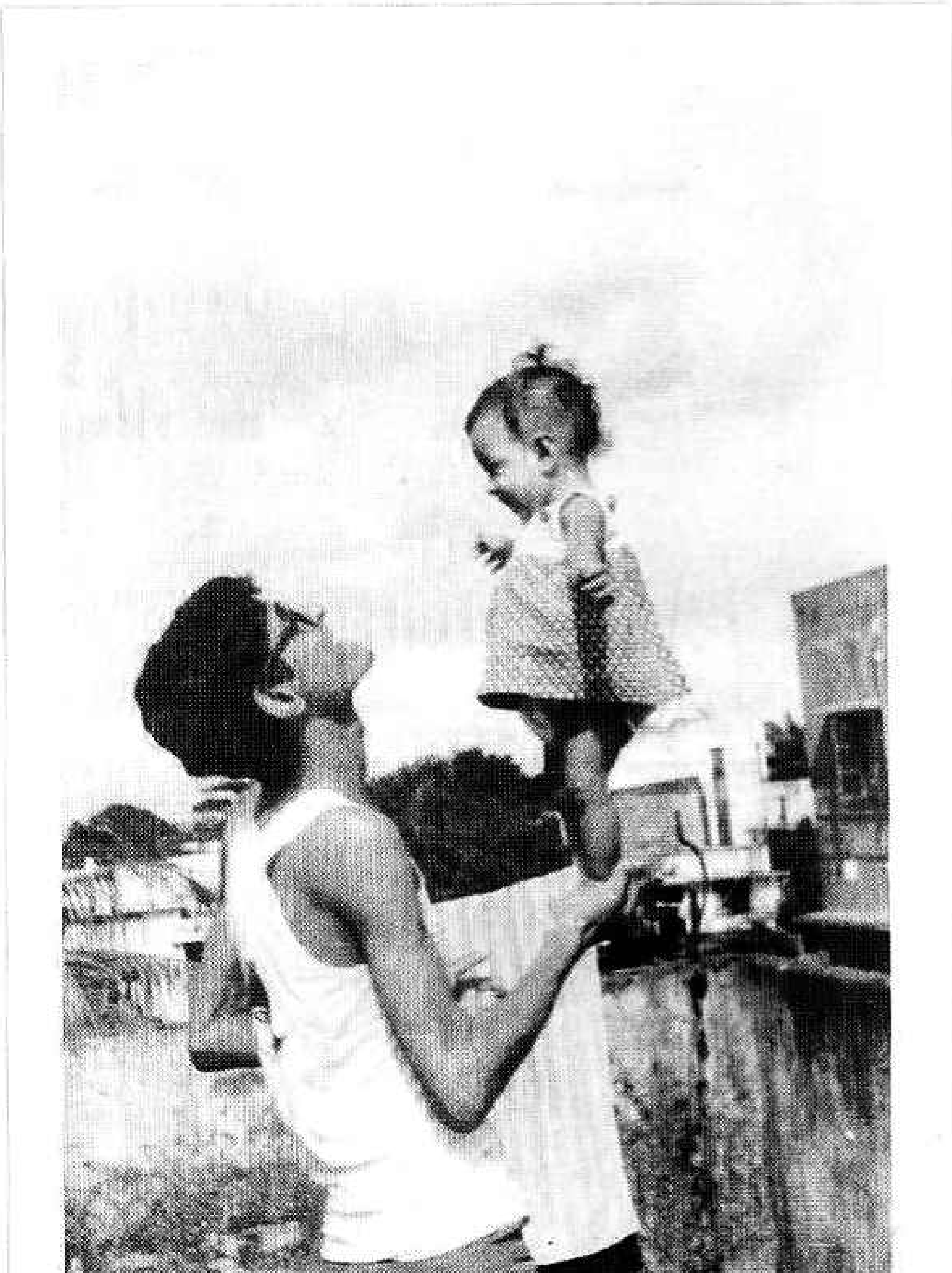

বড় বোন শেফুর মেয়ে শর্মির বয়স মাত্র চার–পাঁচ মাস, তখনো নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে না। তাতে কী? হাতে ব্যালেন্স করে নিয়ে তাকে দাঁড়া করিয়েছি!

থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল মাত্র দশ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে। সেই পুরো ক্লাসটি উপস্থিত রয়েছে কার্জন হলের সিঁড়িতে। আমি বসে আছি, ডান থেকে তিন নম্বর।

যে স্যারেরা আমাদের ক্লাস নিতেন তাঁরা আমাদের দশ জনের সাথে এসে বসেছেন কার্জন হলের সিঁড়িতে। আমি দ্বিতীয় সারিতে ডানদিক থেকে প্রথমে।

শিক্ষা সফর শেষে সবাই ফিরে এসেছি কমলাপুর রেলস্টেশনে। ফার্স্টক্লাসে চড়েছি বোঝানোর জন্যে দাঁড়িয়েছি সেই বগিটারই সামনে! আমি ডানদিক থেকে দুই নম্বর!

আমেরিকা যাবার আগে আগে বন্ধু রুহুল আমীনকে গোপনে বিয়ে দেওয়ার পর স্টুডিওতে গিয়ে তোলা ছবি। সামনে বর–বধূ, পিছনে দুজন সাক্ষী। আমি দাঁড়িয়েছিলাম বরের পিছনে, মুখে প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য!

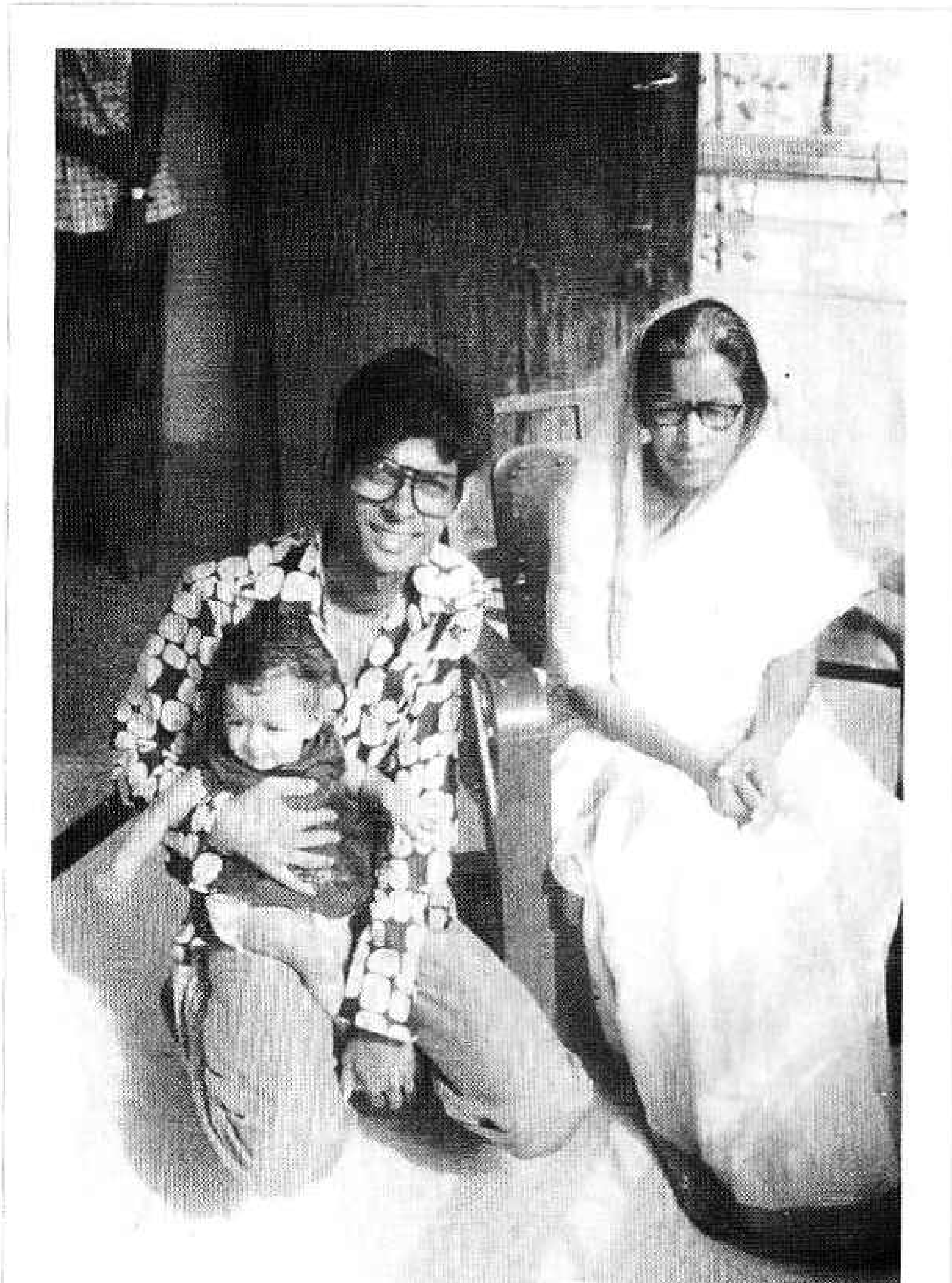

মায়ের সাথে আমি, আমার কোলে বড় বোনের মেয়ে শর্মি

আমেরিকা চলে যাবার আগে আগে মায়ের সাথে ছয় ভাই-বোন। আমি সামনে বসে আছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহপাঠিনী ইয়াসমীন হক—পরবর্তীতে সহধর্মিণী!

থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স বিভাগের দশ জন ছাত্রছাত্রী এবং ছয় জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে আমার আঁকা কার্টুন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সবকিছুর কেন্দ্র ছিল এই কার্জন হল।

চোর ৩

বাসার ছাদে একজন ছিঁচকে চোর ধরা পড়েছে। চোর যে ছিঁচকে শুধু তাই নয় সম্ভবত এই লাইনে নূতন তা না হলে বাসার ছাদে রোদে শুকাতে দেওয়া দুই একটি কাপড় চুরি করতে গিয়ে কেউ এভাবে ধরা পড়ে?

যাই হোক, চোর ধরা পড়লে প্রথমেই তাকে নির্দয়ভাবে পেটানো হয়, তাই এই চোরকেও পেটানো শুরু হল। আমাদের বাসার নিচের তলায় একজন মিলিটারি মেজর থাকতেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে বললেন, "আমি প্রতিদিন সকালে একটা করে ডিম খাই, আমি পর্যন্ত একে পিটিয়ে নরম করতে পারছি না—"

ডিম-খাওয়া মেজর সাহেবের সাথে উপস্থিত অন্যান্য দর্শকদেরও হাত লাগানোর কথা ছিল কিন্তু ততক্ষণে আমার মা খবর পেয়ে গেছেন এবং তাড়াতাড়ি এসে এই চোরকে উদ্ধার করলেন। মার খেয়ে চোর ক্ষতবিক্ষত, তাকে প্রথমে একটা ডাক্তার দেখানো দরকার এবং তারপর সম্ভবত পুলিশে দেওয়া দরকার। চোরকে পেটানোতে উপস্থিত দর্শকদের অনেক উৎসাহ কিন্তু তাকে ডাক্তার দেখানো বা পুলিশে দেবার ব্যাপারে কারো কোনো উৎসাহ নেই। কাজেই খুব দ্রুত সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। এরকম সময়ে যা হবার তাই হল চোরকে চিকিৎসা করিয়ে পুলিশে দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল আমার ছোট ভাই আহসান হাবীবের ওপর। ছোট ভাই হিসেবে বাসার যাবতীয় নিরানন্দ কাজগুলো সবসময়েই তার ঘাড়ে এসে পড়ে। কাজেই সে চোরকে নিয়ে রওনা হল।

চোর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, তাকে নেওয়ার জন্য একটা রিকশা থামানো হল, চোর রিকশা দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, "রিকশা? আমাকে রিকশায় নেবেন?"

ছোটভাই আহ্‌সান হাবীব বলল, "কেন রিকশায় গেলে সমস্যা আছে?"

চোর ঘোষণা করল, "রিকশায় যাব না। আমাকে স্কুটারে নিতে হবে।"

"স্কুটারে?"

"হ্যাঁ। আর চিকিৎসার জন্য কোথায় নিচ্ছেন? ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে তো?"

বলা বাহুল্য চোরের সাথে এই বাক্যালাপ খুব দীর্ঘ হয় নি। ছোট ভাই আহ্‌সান হাবীব অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কারণেই চোরকে নিজের স্কুটারে করে ভালো ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দেওয়ার সুপরামর্শ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল।

আসলে সময়টি ছিল খুব দুঃসময়। দুঃখকষ্ট এবং অভাবের তাড়নায় কত মানুষ যে এপথে আসতে বাধ্য হয়েছিল তার তুলনা নেই। সবচেয়ে কষ্টের দৃশ্য ছিল ভাসমান পতিতারা। গ্রাম থেকে চলে আসা মেয়েগুলো শহরের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এক মুঠো খাবারের জন্যে তারা তাদের জীবনকে কীভাবে তছনছ করে ফেলেছে!

সেই দৃশ্যগুলো এখনো আমরা ভুলতে পারি না।

মানিক গ্রন্থাবলী

ইউনিভার্সিটি থেকে ক্লাস শেষ করে বাসায় যাচ্ছি, নিউমার্কেটের সামনে বলাকা বিল্ডিংয়ের নিচের তলায় বইয়ের দোকানে একটু ঢুঁ মারলাম। সুযোগ পেলেই এখানে ঢুঁ মেরে যাই, নূতন বই দেখতে খুব ভালো লাগে। দোকানের ঠিক মাঝখানে ঝকঝকে অনেকগুলো মোটা মোটা বই সাজানো, হাতে নিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম এগুলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরো সাহিত্যকর্ম। প্রচ্ছদে সুদর্শন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখাবয়বের একটা অংশ, উপরে লেখা—মানিক গ্রন্থাবলী। একেকটা খণ্ড একেকটা রঙের। বইগুলো দেখে একেবারে আক্ষরিক অর্থে আমার মুখে পানি চলে এল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনিতেই আমার প্রিয় লেখক, সেই লেখকের পুরো সাহিত্যসমগ্র একসাথে দেখেও নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। দোকানিকে দাম জিজ্ঞেস করলাম, পুরো সেট তিন শ টাকার মতো। দাম শুনে আমি একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, তিন শ টাকা দিয়ে প্রায় রাজ্য জয় করা যায় এত টাকা আমি কোথায় পাব? আমি পরম আদরে বইগুলোতে হাত বুলিয়ে বের হয়ে এলাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটি আর ঘুরেফিরে শুধু সেই বইগুলোর কথা মনে হয়।

বাসায় এসে আমি ভাইবোনদের এই মানিক গ্রন্থাবলীর কথা বললাম। "তোরা বিশ্বাস করবি না পুরো মানিক গ্রন্থাবলীর সেট! কী যে সুন্দর বইগুলো নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবি না। এই মোটা মোটা একেকটা বই। কী সুন্দর আধুনিক তার প্রচ্ছদ, কী সুন্দর ছাপা!"

ভাইবোনদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, "দাম কত?"

দাম শুনে তারাও আমার মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। টাকা-পয়সার তখন খুব টানাটানি, কীভাবে দিন চলছে কেউ ভয়ের চোটে জানতে চাই না। আমার মা কীভাবে কীভাবে জানি সংসারের ঘানি টেনে যাচ্ছেন।

খাবার টেবিলে বসে আমি আবার মানিক গ্রন্থাবলীর বর্ণনা দিতে শুরু করি। মধ্যবিত্তের সন্তান রাস্তায় একটা দামি গাড়ি দেখে বাসায় এসে যেভাবে সেই চকচকে গাড়ির বর্ণনা দেয় অনেকটা সেরকম। কখনো সেই গাড়ির মালিক হতে পারবে না কিন্তু সেটা নিয়ে কল্পনা করতে দোষ কী?

বিকেলবেলা বের হব, আমার মা তখন আমার হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "নে।"

আমি বললাম, "কী?"

"তোর মানিক গ্রন্থাবলী কিনে নিয়ে আয়।"

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, "কিনে আনব? আমি? মানিক গ্রন্থাবলী? সত্যি?"

মা বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি।"

টাকাটা কোথা থেকে যোগাড় করেছেন কীভাবে যোগাড় করেছেন, এই চরম দুঃসময়ে এতগুলো টাকা দিয়ে বই কেনার মতো এত বড় বিলাসিতা করা ঠিক হচ্ছে কি না এরকম নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেত—আমি কোনো প্রশ্নই করলাম না, মুঠিতে টাকাগুলো শক্ত করে ধরে প্রায় ছুটে চললাম সেই বইয়ের দোকানে। ভয়ে বুক ধুকপুক করছে, গিয়ে যদি দেখি কোনো এক বিশাল বড়লোক গাড়ি হাঁকিয়ে এসে আমার মানিক গ্রন্থাবলী তুলে নিয়ে চলে গেছে তখন কী হবে? দোকানে এসে উঁকি দিয়ে বুকে পানি ফিরে এল—না, এখনো কেউ নেয় নি। আমি পরম আদরে বইগুলোতে হাত বুলিয়ে দোকানির হাতে টাকা ধরিয়ে দিলাম!

অনেকগুলো বই একা আনা যাবে না, সাথে আরেকজন বন্ধু আছে, দুইজনে মিলে ঘাড়ে করে নিয়েছি, কিছু রিকশা কিছু ঘাড়ে করে বইগুলো বাসায় এনেছি। আমার ঘাড়ে বিশাল মানিক গ্রন্থাবলীর পুরো সেট দেখে বাসায় হইচই শুরু হয়ে গেল।

এর পরের দিনগুলো ভারি মজার। কেউ বিছানায় আধশোয়া হয়ে মানিক গ্রন্থাবলীর এক খণ্ড নিয়ে বসেছে, কেউ বসেছে বারান্দায় পা ছড়িয়ে, কেউ

ফ্লোরে বুকের নিচে বালিশ নিয়ে বসেছে, কেউ সোফায় পা তুলে দিয়েছে হাতে এক খণ্ড মানিক গ্রন্থাবলী! বাসায় শুধু মানিক, মানিক আর মানিক।

এই জীবনে তারপর কতবার কত কিছু কিনেছি—কিন্তু সেই মানিক গ্রন্থাবলী কেনার মতো আনন্দ আর কখনো পাই নি! আমি জানি আর কখনো পাবও না।

গালি

ফজলুল হক হল এবং শহীদুল্লাহ হল পাশাপাশি, মাঝখানে শুধু একটা পুকুর। দুই হলের ছেলেরা দিনের বেলা কার্জন হলে স্বাভাবিক মানুষের মতো পাশাপাশি ক্লাস করে, সন্ধে হবার পর থেকেই তাদের মাঝে এক ধরনের পরিবর্তন ঘটে, তখন জানালা দিয়ে এক হলের ছেলেরা অন্য হলের ছেলেদের গালাগাল করে। সেই গালাগালের ভাষা, শব্দচয়ন, কৌতুকবোধ, সৃজনশীলতা এবং গলার জোরের কোনো তুলনা নেই। কোনো বিরোধ নেই, রাগ বা বিরক্তি নেই, অপছন্দ নেই শুধু গালাগাল দেবার জন্য গালাগাল করার এরকম উদাহরণ পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।

একদিন সন্ধেবেলা আমরা বের হব। যাওয়ার মুহূর্তে আমাদের একজনের কী মনে হল কে জানে, জানালা দিয়ে মুখ বের করে চিৎকার করে বলল, "ঐ ঐ ঐ ঐ..."

সাথে সাথে শহীদুল্লাহ হলের কোনো একজন জানালায় মুখ লাগিয়ে আরো জোরে চিৎকার করে বলল, "ঐ ঐ ঐ ঐ..."

ব্যস, সাথে সাথে দুই হলের মাঝে গালাগালের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আমরা হাসতে হাসতে বের হয়ে গেলাম।

গভীর রাতে ফিরে এসে দেখি ধুন্ধুমার অবস্থা। তখনো দুই হলের মাঝে গালাগাল চলছে। দুই পক্ষই মাইক ভাড়া করে নিয়ে এসেছে এবং খালি গলার ওপর ভরসা না করে মাইক দিয়ে এক হলের ছেলেরা অন্য হলকে টানা গালাগাল

করে যাচ্ছে! সেই গালাগালের কী ভাষা, কী তেজ, কী শব্দচয়ন—আমরা মুগ্ধ হয়ে সেটা উপভোগ করতে থাকি।

নিজের হাতে ছোট একটা বীজ বপনের পর সেটা যখন মহীরুহ হয়ে ওঠে তখন কার না ভালো লাগে?

প্রক্সি

আমি ইলেকট্রনিক্স ক্লাসে যাই না, এক বন্ধুকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি সে আমার হয়ে ক্লাসে আমার উপস্থিতিটা দিয়ে দেয়। সে একদিন এসে আমাকে জানাল যে সে ক্লাসে আমার প্রক্সি দিতে পারছে না। আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "সে কী! তোমাকে বিশ্বাস করে দায়িত্ব দিয়েছি—"

"আমার প্রক্সি দিতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"ক্লাসে স্যার তোমার রোল নম্বর ডাকেন না। তোমার রোল নম্বর না ডাকলে আমি কেমন করে তোমার প্রক্সি দেব?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন আমার রোল নম্বর ডাকেন না?"

বন্ধুটা মাথা চুলকে বলল, "মাঝখানে কয়দিন মিস হয়ে গিয়েছিল তখন স্যার ভাবলেন তুমি হয়তো আর ক্লাসে আসবে না। তাই তোমার রোল নম্বর ডাকা বন্ধ করে দিয়েছেন।"

"এখন উপায়?"

"তোমাকে ক্লাসে গিয়ে তোমার রোল নম্বর আবার ডাকানো শুরু করতে হবে।"

আমি একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ক্লাসে হাজির থাকে না বলে যে ছাত্রের রোল নম্বরই ডাকা হয় না ক্লাসে গিয়ে তার রোল নম্বর ডাকানোর ব্যবস্থা করার মাঝে খানিকটা ঝামেলা আছে। কিন্তু আমার উপায় নেই, ক্লাসে যেতেই হবে, রোল নম্বরটা ডাকানো শুরু করতেই হবে। নির্দিষ্টসংখ্যক উপস্থিতি না

থাকলে পরীক্ষা দেওয়া যায় না। তিন বছর পড়ার পর যদি পরীক্ষা দিতে না পারি তাহলে মহা কেলেংকারি হয়ে যাবে।

ইলেকট্রনিক্স বিষয়টা কিন্তু আমার খুব প্রিয় বিষয়। আমি বেশ ভালো ইলেকট্রনিক্স জানি, সবই নিজে নিজে শেখা। আমাদের সিলেবাসে যে ইলেকট্রনিক্সটুকু আছে সেটা হচ্ছে ভাল্‌বের ইলেকট্রনিক্স। পুরো পৃথিবী থেকে ভালব উঠে গিয়েছে তার বদলে এসেছে ট্রানজিস্টর। আমাদের ট্রানজিস্টর পড়ানো হয় না, পড়ানো হয় ভাল্‌ব। সারা পৃথিবীর কোথাও যে ভাল্‌ব নেই সেটা কেন আমাদের পড়তে হবে এবং পরীক্ষা দিতে হবে সেই প্রশ্নটাও আমি কাউকে করতে পারি না। ক্লাসের সুবোধ ছেলেরা সেই প্রশ্ন করে না নিয়মিত ক্লাস করে। আমি ক্লাস করা ছেড়ে দিয়েছি পরীক্ষার আগে নাকমুখ গুঁজে কয়দিন পড়ে পরীক্ষা দিয়ে দেব, সেটাই আমার পরিকল্পনা। কিন্তু সেই পরিকল্পনাতেও এখন মনে হচ্ছে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে।

কাজেই পরের দিন আমি ক্লাসে গেলাম। ক্লাসের সবার কাছে এর মাঝে খবর চলে গেছে, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে! যাই হোক, স্যার এলেন, রেজিস্টার খাতা খুলে রোলকল শুরু করলেন। আমার আগের রোল নম্বর ডাকলেন এবং আমার রোল নম্বরটি বাদ দিয়ে পরের রোল নম্বরটি ডাকলেন। আমি তখন লজ্জার মাথা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "স্যার।"

স্যার আমার দিকে তাকালেন, "কী হয়েছে?"

"স্যার, আপনি আমার রোল নম্বরটি ডাকেন নি।"

স্যার আমার দিকে কিছুক্ষণ ব্যথিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। যে কারণেই হোক আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আমাকে সবাই চেনে। নিজেকে কখনই ধোয়া তুলসী পাতা হিসেবে দাবি করছি না কিন্তু লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালো ছিলাম সেজন্যে স্যারেরা আমাকে এক ধরনের স্নেহ করতেন। সেই স্যার যখন আবিষ্কার করেন তার প্রিয় ছাত্র ক্লাসেই আসে না তখন ব্যথিত হতেই পারেন। স্যার একটা কথাও না বলে আমার রোল নাম্বারের পাশে আমার উপস্থিতিটা লিখলেন! পরদিন থেকে আমার রোল নম্বর ডাকা শুরু হল এবং আমি উধাও হয়ে গেলাম। আমার বন্ধু আবার আমার প্রক্সি দিতে শুরু করল।

আমাদের ইলেকট্রনিক্স স্যার ড. জামিলুর চৌধুরীর সাথে কয়েক বছর আগে আমেরিকায় দেখা হয়েছিল, আমি তখন স্যারকে এই পুরো ঘটনা খুলে বলেছি। স্যার সব শুনে আমাকে মাপ করে দিয়েছেন।

আমি যখন ক্লাস নিই তখন কোনো ছাত্র যখন অন্য ছাত্রের হয়ে প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় আমি তখন তাদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে খুব রেগে যাবার ভান করি, আসলে কিন্তু মনে মনে সব সময়েই তাদের মাপ করে দিই।

সাঁতার

মাঘ মাসের কনকনে শীত। সামনে পরীক্ষা সবাই ধুমিয়ে লেখাপড়া করছে—তিন বছর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি এখন পরীক্ষার আগে পড়ালেখা না করলে কেমন করে হবে? পড়ালেখা করা খুব কঠিন পরিশ্রমের কাজ। কয়েক ঘণ্টা টানা পরিশ্রম করার পর সবারই খানিকটা বিশ্রামের দরকার হয় তখন তারা আমাদের রুমে চলে আসে। আমাদের রুমে চা খাবার ব্যবস্থা আছে। আমি আর আমার রুমমেট (একেবারে আমার স্কুল জীবনের বন্ধু—যার সঙ্গে তুই সম্পর্ক) চা খাবার পর পুরোনো চা পাতাগুলো ফেলে দিই না, বন্ধুদের খাওয়ানোর জন্য রেখে দিই, তারা সেই রি-সাইকেল চা পাতা দিয়ে তৈরি চা বেশ খুশি হয়েই খেয়ে ফেলে, কোনো কিছু সন্দেহ করে না। পড়ালেখায় ভালো কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে হাবাগোবা একজনকে একদিন চায়ের মাঝে চিনি না দিয়ে লবণ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, সে আপত্তি না করে খেয়ে ফেলেছিল!

যাই হোক মাঘ মাসের কনকনে শীতের রাতে রুমে বসে যখন সবাই আসন্ন পরীক্ষার যন্ত্রণা নিয়ে কাতর শব্দ করছি তখন আমার রুমমেট (ভালো নাম রফিকুল আলম, খাজা বলে ডাকি) বলল, "চল, পুকুরে গিয়ে সাঁতার কাটি।"

যারা আমাদের কাজকর্মের সাথে পরিচিত না তাদের কাছে বিষয়টাকে একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে এগুলো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। গভীর রাতে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে তখন কেউ একজন বলল, "চল হেঁটে আসি।" ফজলুল হক হল থেকে হেঁটে হেঁটে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত চলে এসেছি। পথে কুকুর এবং মাঝেমধ্যে পুলিশ ছাড়া আর কেউ নেই। কুকুর বিরক্ত করে না

কিন্তু পুলিশ বেশ বিরক্ত করে। রাত দুটোর সময় টিপটিপে বৃষ্টিতে ভিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রের নৈশভ্রমণের শখ হওয়াটা যে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে সেটা পুলিশকে বোঝানো খুব শক্ত।

কাজেই আমার রুমমেট খাজা যখন মাঘ মাসের রাতে কনকনে শীতের মাঝে পুকুরে সাঁতরানোর প্রস্তাব দিল তখন অনেকেই কিছু একটা করার পেয়ে আহ্লাদিত হয়ে উঠল। পড়ালেখায় খুব ভালো, বোর্ডে ফার্স্ট হয়ে এসেছে কিন্তু বাস্তববুদ্ধি খুব বেশি নেই সেরকম একজনের উৎসাহ হল সবচেয়ে বেশি। ব্যাপারটা যে একটা ষড়যন্ত্র হতে পারে সে বেচারা ঘুণাক্ষরেও সেটা সন্দেহ করে নি। গভীর রাতে পুকুরে সাঁতার দেবার প্রস্তাব যে দিয়েছে সে নিজে যে সাঁতার জানে না সেটা আমার এই বন্ধু জানত না!

কিছুক্ষণের মাঝেই হলের অনেক ছেলেকে নিয়ে দল বেঁধে আমরা পুকুর ঘাটে হাজির হলাম। লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে খালি গায়ে সবাই পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়েছি। আমি বললাম, "ওয়ান টু থ্রি" সাথে সাথে ঝপাং করে একটা শব্দ। এবং একটাই—আমাদের সেই বোর্ডে ফার্স্ট হওয়া বন্ধু একা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অন্য সবাই পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে এই নির্মম রসিকতাটুকু প্রাণভরে উপভোগ করে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে!

আমরা আমাদের বন্ধুকে পানি থেকে টেনে তুলে নিয়ে এলাম, বলা বাহুল্য সে আমাদের ওপর খুব রাগ করল! তার রাগ আরো এক শ গুণ বেড়ে গেল যখন পরদিন ক্লাসে রটিয়ে দিলাম আমার এই বন্ধুটি আত্মহত্যা করার জন্য গভীর রাতে পুকুরে লাফিয়ে পড়েছিল অনেক কষ্ট করে পানি থেকে টেনে তুলেছি। অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই, আমাদের ক্লাসেরই একজন সহপাঠিনীর জন্য তার যে বাড়াবাড়ি দুর্বলতা সেটাও সবাই জানে!

আমার সেই বন্ধু এখন নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামিদামি প্রফেসর, এখনো আমার খুব ভালো বন্ধু। আমার যখন কোনো ঝামেলা হয় সবার আগে তার সাথে যোগাযোগ করি, জানপ্রাণ দিয়ে সে আমাকে সাহায্য করে।

মনে হয় এতদিনেও তার বাস্তববুদ্ধি হয় নি তা না হলে আমার সমস্ত ঝামেলা এভাবে নিজের ঘাড়ে কেমন করে তুলে নেয়?

ওয়াজি উল্লাহ

গভীর রাত, আমাদের ঘুমানো উচিত, চুটিয়ে আড্ডা হচ্ছে তাই কারো শুতে যাবার তাড়া নেই। তখন হঠাৎ করে একজন বলল, "চল প্ল্যানচেট করি।"

প্ল্যানচেট করে মৃত আত্মা নিয়ে এসে তাদের সাথে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে আমাকে একজন বিশেষজ্ঞ বিবেচনা করা হয়। তার কারণ আছে, আমার বাবার এই বিষয়ে খুব আগ্রহ ছিল তাই বাসায় এইসব বিষয়ের ওপর অনেক বই। সেগুলো পড়ে পড়ে প্রথমে 'তাত্ত্বিক' জ্ঞান অর্জন করেছি; কলেজে পড়ার সময় সেই তাত্ত্বিক জ্ঞান ব্যবহার করে কিছু 'ব্যবহারিক' জ্ঞান অর্জন করেছিলাম। কাজেই প্রেতাত্মার সাথে যোগাযোগ করার সময় সবাই আমার শরণাপন্ন হয়।

আমি বিশেষজ্ঞসুলভ ভঙ্গি করে বললাম, "এক রাতে হুট করে বসে আত্মা ডাকলেই তো আর চলে আসবে না। তার জন্য সাধনা করতে হয়। তবে—"

সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকাল, "তবে?"

"ভালো একজন মিডিয়াম নিয়ে বসলে অন্য কথা। ভালো মিডিয়ামে আত্মা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। মিডিয়ামের কষ্ট হয় না।"

"ভালো মিডিয়াম কে আছে?"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "তারিক ভাই।"

যখন ঢাকা কলেজে পড়ি, সাউথ হোস্টেলে থাকি তখন প্রায় রাতেই আমরা চক্রে বসে 'মৃত আত্মা'দের সাথে যোগাযোগ করতাম। এই চক্রে বসার সময় প্রায় সব সময়েই মিডিয়াম হতেন আমাদের তারেক ভাই। এই বিষয়টা কী

সেটা বোঝার আমার খুব একটা আগ্রহ ছিল। যখনই কোনো 'মৃত আত্মা' এনেছি, বেঁচে থাকতে সে কোথায় থাকত কী করত সেগুলো জানার চেষ্টা করতাম। সেই ঠিকানায় চিঠি লিখে আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতাম। আমরা এরকম অনেক চিঠি পাঠিয়েছিলাম কিন্তু ভুল ঠিকানা বলে সব চিঠি ফেরত এসেছে। সোজা কথায় বলা যায় মৃত আত্মার সাথে যোগাযোগ করার মাঝে এক ধরনের অলৌকিক রহস্যময়তা আছে কিন্তু এক বিন্দু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলে চক্রে বসে আত্মা প্রেতাত্মাকে ডেকে আনা যাবে না সেটা কে বলেছে?

যাই হোক, আমার কথা শুনে সবাই একটু দমে গেল। রাতদুপুরে ঘাড়ে ভূত নামানোর জন্য সিনিয়র একজন ভাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার কথা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু আমি ভূত বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাদের অভয় দিলাম, ঠিক কী কারণ জানা সেই প্ল্যানচেটে যারা মিডিয়াম হয় তাদেরকে যখনই এই কাজে ডাকা হয় তারা খুব আগ্রহ নিয়ে রাজি হয়ে যায়। কাজেই আমাদের ছোট দলটি ফজলুল হক হলের দোতলায় তারেক ভাইয়ের ঘরটা খুঁজে বের করে দরজায় ঘা দিল। একটু পরেই ঘুম থেকে উঠে তারেক ভাই দরজা খুলে এতগুলো মানুষকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। একজন সাহস করে বলল, "আমরা প্ল্যানচেট করে মৃত আত্মা আনতে যাচ্ছিলাম। আপনি যদি একটু রাজি হন—"

সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিতে মনে হবার কথা এই কথায় তারেক ভাই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলবেন, "রাতদুপুরে মশকরা করতে এসেছ? ভাগো এখান থেকে—" কিন্তু সেরকম কিছু হল না। তারেক ভাই দুই এক সেকেন্ড ভেবে বললেন, "চল যাই।"

কাজেই কিছুক্ষণের ভেতরেই তিন তলার একটা ঘরে আমরা ছোটখাটো একটা দল প্ল্যানচেট করতে বসে গেলাম। দলের ভেতর যারা সাহসী তারা গোল হয়ে একজনের হাতের ওপর আরেকজন হাত রেখে বসেছে। যারা ভীতু এবং অবিশ্বাসী তারা পাশের খাটে গুটিসুটি মেরে বসেছে। আমি প্ল্যানচেট-পূর্ব একটা ভূমিকা দিলাম। ভূমিকাটা এরকম, "দেখো এটা ঠাট্টা তামাশার ব্যাপার না। এটা খুব সিরিয়াস বিষয়। আমরা মৃত আত্মাদের ডাকব। তারা যদি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আসতে চান তা হলে আসবেন। আমাদের কারো ওপরে এসে ভর

করবেন। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই— যদি কেউ মনে করে তার ওপর আত্মা এসে ভর করছে তাকে ভর করতে দেবে। বাধা দেবে না।"

অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না কিন্তু আমার গুরুগম্ভীর বক্তৃতায় সবাই যে কম বেশি কাবু হয়ে যায় তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। আমি থমথমে গলায় বলি, "যখন মৃত আত্মা আমাদের কারো ওপর এসে ভর করবেন তখন দেখবে সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। তার হাত পা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকবে। সে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে—কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। অজ্ঞান অবস্থাতেই মিডিয়াম মৃত আত্মার হয়ে কথাবার্তা বলবে। যখন আমাদের সাথে কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবে আমরা মৃত আত্মাকে চলে যেতে অনুরোধ করব, মৃত আত্মা চলে যাবেন।"

একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "যদি যেতে না চায়?"

আমি বলি "তখন হাত ছেড়ে দিয়ে চক্র ভেঙে দিতে হয়। চক্র ভেঙে দিলে আত্মা চলে যায়। তারপরেও যদি না যায় তখন ঘরের আলো জ্বেলে দিতে হয়! চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে হয়। মিডিয়ামের জ্ঞান ফিরে আসে, আত্মা চলে যায়।"

আমার গুরুগভীর বক্তৃতার পর সবাই হাতে হাত রেখে চক্রে বসে যায়। আমি ফিসফিস করে বলি, "তোমরা সবাই মৃতদের কথা ভাব, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কোথায় যায় ভাব, তাদের আত্মাকে ডাক। গভীর মনোযোগ দাও, তোমাদের ডাক শুনে তারা আসবেন—"

সাধারণত আমার এই আহ্বানের পর কিছুক্ষণের মাঝেই কোনো একজনের হাত কাঁপতে থাকে, বড় বড় নিশ্বাস নিতে থাকে। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করি, "আপনি কি এসেছেন?"

প্রায় অশরীরী গলায় একজন উত্তর দেয়, "এ–সে–ছি!"

যারা কখনো এ ধরনের কিছু দেখে নি তাদের জন্য সেটা ভয়ংকর একটা অভিজ্ঞতা। তারেক ভাইকে মিডিয়াম হিসেবে পেলে কখনো কাউকে এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতে হয় নি।

তবে আজকে প্ল্যানচেট করতে বসে এত সহজে আত্মাকে আনা যাচ্ছিল না। আত্মা আসি আসি করছে কিন্তু আসছে না। যারা প্ল্যানচেট করতে বসেছে তারা

খুব সিরিয়াস নয়, চক্রে বসে উসখুস করছে। অবিশ্বাসী এবং দর্শকের সংখ্যা অনেক বেশি। তাদেরকে একেবারে নিঃশব্দে বসে থাকার কথা কিন্তু তারা ক্রমাগত ফিসফিস করে কথা বলছে, মাঝে মাঝে হাসি চেপে রাখার চেষ্ট করছে এবং উপস্থিত সবার মনোযোগ নষ্ট করে দিচ্ছে। এরকম সময় একটা জমাট ভূতের গল্প বলা হলে সাধারণত অবস্থার উন্নতি হয়, সবাই চুপ করে যায়।

তাই সবাইকে লাইনে আনার জন্য একটা ভূতের গল্প ফেঁদে বসলাম। শোনা গল্প, চরিত্রের নামগুলো পরিচিত মানুষের নাম দিয়ে পাল্টে দিয়ে সেই গল্পটি বর্ণনা শেষ করেছি। মোটামুটি ভয়ংকর একটা গল্প শুনে সবার লোম দাঁড়া হয়ে গেল। গল্প শেষ করার পর আবার চক্রে বসেছি এবং তখন হঠাৎ একটি অত্যন্ত বিচিত্র ঘটনা ঘটল। ভূতপ্রেত নিয়ে আমার এই সাধনার এই বিশাল অভিজ্ঞতায় কখনো আগে সেটা ঘটে নি। পাশের খাটে দড়াম করে একটা শব্দ হল, কেউ একজন কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেছে এবং অন্য সবাই ভয়ে আতংকে চিৎকার করে উঠেছে।

চক্রে বসার সময় হঠাৎ করে আলো জ্বালানো নিষেধ, সবকিছু করতে হয় ধীরে, কোমলভাবে। কিন্তু পাশের খাট থেকে একটা ছটফটানোর শব্দ এবং চাপা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছি, সবাই চিৎকার করছে, এরকম সময়ে নিয়মকানুন মানা সম্ভব নয়। দৌড়ে গিয়ে একজন লাইট জ্বালাল, তারপর আমরা যে দৃশ্য দেখলাম সেটি ভোলার নয়। বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ফিরোজ খাটের মাঝে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, তার চোখ বন্ধ এবং সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। একজন মানুষের শরীর যে এভাবে কাঁপা সম্ভব আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

যারা উপস্থিত ছিল ভয়ে তারা সবাই দুদ্দাড় করে পালিয়েছে, বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ঘরের ভেতর শুধু আমি এবং ফিরোজের রুমমেট। সেও একই ডিপার্টমেন্টের, তার নামও ফিরোজ।

যখন হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি তখন খাটে শুয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকা ফিরোজ আমাকে বিদঘুটে গলায় আদেশ দিল, "ছেলেটাকে ধরো।" অনুমান করলাম ছেলে বলতে সে নিজেকেই বোঝাচ্ছে।

আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ফিরোজকে ধরলাম, সারা শরীর থরথর করে

কাঁপছে, ছোটখাটো কাঁপুনি নয়, ভয়ংকর এক ধরনের ঝাঁকুনি—তাকে ধরে রাখা যায় না। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কে?"

ফিরোজের গলা থেকে অপরিচিত একটা কণ্ঠ উত্তর দিল, "আমি ওয়াজিউল্লাহ। আমি একজন জীন।"

ভূতপ্রেত নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি এর আগে অনেকবার অনেক কিছু দেখেছি কিন্তু জীন এই প্রথম। আমরা জীনকে ডাকি নি, সে কেন এসেছে আমাদের কোনো ধারণা নেই। মৃত মানুষের আত্মা হলে তার সাথে কী ধরনের ব্যবহার করতে হয় আমার পড়া আছে, বইপত্রে সেসব লেখা ছিল কিন্তু জীন চলে এলে তাকে কী করতে হয় আমার সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তাই যেটা সহজ সেটাই করলাম, গলার স্বর যথেষ্ট মোলায়েম করে বললাম, "আমাদের কাছে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন আপনি যান।"

জীন ওয়াজিউল্লাহ্ গমগমে গলায় বলল, "আমি যাব না।"

আমি অনুনয় করলাম, বললাম, "প্লিজ, চলে যান!"

জীন ধমক দিয়ে বলল, "না, আমি যাব না। এই ছেলেটার মনে অনেক কষ্ট। আমি একে নিয়ে যাব।"

শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এই ছেলেটাকে নিয়ে যাবে মানে কী? তাকে মেরে তার আত্মা নিয়ে যাবে, নাকি অন্য কিছু? জীনের কবলে আটকে পড়া ফিরোজ আমাদের সবার বন্ধু, খুব ভালো ছাত্র। চুপচাপ শান্ত। মুক্তিযুদ্ধের সময় ফ্রগম্যান হয়ে যুদ্ধ করেছে কিন্তু কখনো কাউকে সেটা নিয়ে কিছু বলে না। অসম্ভব রূপবান, খুব সুন্দর অভিনয় করে—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকে তাকে সব সময়েই আমরা নায়কের ভূমিকা দিই। এমনিতে খুব ধার্মিক, হলের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে। ভূতপ্রেত আনার এই বিষয়গুলো সে বিশ্বাস করে না, আজকে মজা দেখতে এসে সে এই বিপদে পড়েছে।

গভীর রাতে হলের একটা ঘরে এই ঘটনা ঘটছে। বাইরে চেঁচামেচি হইচই এবং মোটামুটি হলের অর্ধেক ছেলেই ঘুম থেকে উঠে গেছে। কারো ঘরের ভেতরে ঢোকার সাহস নেই বাইরে থেকে দেখছে ফিরোজ বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, সারা শরীর কাঁপছে এবং আমি তাকে খাটের সাথে চেপে ধরে রেখে অনুনয় বিনয় করছি।

অনুনয় বিনয়ে কাজ হল না বলে একজনকে দিয়ে পানি আনিয়ে তার মুখে পানির ঝাপটা দিলাম কিন্তু কোনো লাভ হল না। ফিরোজের জ্ঞান ফিরে এল না, অচেতন অবস্থায় সে নানা ধরনের ভয় দেখানো কথা বলতে লাগল। আমার জানা সেকুলার পদ্ধতি কাজে লাগছে না দেখে আমি শেষ চেষ্টা হিসেবে ধর্মীয় পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করলাম। ছোটবেলায় নানীর কাছে অনেক ভূতপ্রেতের গল্প শুনেছি, নিজের জীবনে দেখা অসাধারণ সব ভূতের গল্প আমার নানী অবলীলায় বলে যেতেন। তার কাছে শুনেছি ভয়ংকর ভূতপ্রেত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আয়াতুল কুরসি পড়তে হয়। আমি তাই অনেক কষ্টে আয়াতুল কুরসি মুখস্থ আছে এরকম একজনকে ডেকে আনলাম। সে ভয়ে ভয়ে আয়াতুল কুরসি পড়তে থাকে কিন্তু তাতে জীন ওয়াজিউল্লাহ আরো মজা পেয়ে যায়। মোটামুটি একটা প্রতিযোগিতার মতো সে আরো দ্রুত আয়াতুল কুরসি পড়ে খনখন করে হাসতে থাকে! শুধু তাই না আমাদের টিটকারি করে বলতে থাকে, "পারবি না! পারবি না!"

এদিকে সময় পার হয়ে যাচ্ছে, রাত আরো গভীর হতে শুরু করেছে। ফিরোজ যেভাবে থরথর করে কাঁপছে, তাতে তার কোনো বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না। কী করব বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। আমাদের কাছে এটা ভৌতিক সমস্যা কিন্তু ডাক্তারের কাছে সেটা নিশ্চয়ই ডাক্তারি সমস্যা। দুই–চারটা ইনজেকশন দিয়ে তাকে নিশ্চয়ই ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু হাসপাতালে নেওয়া কাজটিও সহজ নয়। প্রভোস্ট কিংবা হাউজ টিউটরকে ঘুম থেকে তুলে তাকে দিয়ে হাসপাতালে ফোন করিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স আনতে হবে। প্রভোস্ট এবং হাউজ টিউটরকে খবরটা কেমন করে দেওয়া হবে চিন্তা করে আমার কালো ঘাম ছুটে গেল! মধ্যরাতে ঘুম থেকে ডেকে তোলার পর একজন সহজ একটা বিষয়ই বুঝতে চায় না, তাকে এই ভূতপ্রেত সাধনা এবং ভুল করে জীন চলে আসার ব্যাপারটা কেমন করে বোঝাব? আমি ফিরোজকে চেপে ধরে রেখেছি, তাকে ছেড়েও যেতে পারছি না। অন্য কেউ যেতেও রাজি হচ্ছে না। সবাই মিলে এই ভূতের ব্যবসা শুরু করেছিলাম এখন যখন বিপদ এসেছে দায়দায়িত্ব পুরোটুকু আমার! ইচ্ছে হচ্ছে গলা ফাটিয়ে কাঁদি।

প্রভোস্টকে ডেকে তোলার আগে শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি দুজনকে পাঠালাম মসজিদের ইমামকে ডেকে আনতে। ভাসা ভাসাভাবে একবার একটা গল্প শুনেছিলাম একজনকে জীন ধরার পর কোনো একটা বিশেষ উপায়ে দোয়া দরূদ পড়ে তাকে জীনমুক্ত করা হয়েছিল। ইমাম সাহেব আসবেন আমি আশা করি নি কিন্তু সেই রাতদুপুরে তিনি হাজির হলেন। পুরো ব্যাপার দেখে তিনি অসম্ভব ঘাবড়ে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"জীনে ধরেছে।"

ফিরোজ নিয়মিত নামাজ পড়ে তাই ইমাম সাহেব তাকে খুব ভালো করে চেনেন, তাকে খুব পছন্দও করেন। কিছুক্ষণ ফিরোজকে দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন করে ধরল?"

আমি বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম, সেই ব্যাখ্যা শুনে তার চোখ বড় হয়ে গেল, এক ধরনের আতংক নিয়ে তিনি বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার মুখ দেখে মনে হল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছেলেপিলে রাতদুপুরে এরকম একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে তিনি সেটাই বিশ্বাস করতে পারছেন না। ইমাম সাহেব কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "একটু সরিষার তেল আর একটুকরো সুতো আন।"

আমরা দৌড়াদৌড়ি করে সুতা এবং তেল নিয়ে আসি। তিনি তেলে সুতো ভিজিয়ে কী একটা সুরা পড়ে সুতার মাঝে ফুঁ দিয়ে সুতায় একটা করে গিঁট দিতে থাকেন। কী আশ্চর্য, যে ভয়ংকর ওয়াজিউল্লাহকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলাম না হঠাৎ করে সে একেবারে শান্তশিষ্ট হয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমি যাচ্ছি...আমি যাচ্ছি...আমি যাচ্ছি...আমি যাচ্ছি..."। ইমাম সাহেব সুতাতে গিঁট দেওয়া শেষ করার আগেই ফিরোজ চোখ মেলে তাকাল। চোখেমুখে মাথার পানি দেওয়ার কারণে সে এখন থৈ থৈ পানিতে শুয়ে আছে। তার চারপাশে অসংখ্য ছেলে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। মাথার কাছে বসে আছে মসজিদের ইমাম সাহেব। সে অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে এখানে?"

এখানে কী হয়েছে সেটা তখন সবাই শতকণ্ঠে বোঝাতে শুরু করেছে। ইমাম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, আমার দিকে রুষ্ট চোখে তাকিয়ে বললেন,

"এইসব ব্যাপার নিয়ে কেউ এগুলো করে? সর্বনাশ! খবরদার। ভবিষ্যতে কখনো এগুলো নিয়ে ছেলেখেলা করবে না।"

আমি মাথা নাড়লাম, "করব না।" তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি এই জীনকে দূর করার জন্য কোন দোয়া পড়েছেন?"

ইমাম সাহেব বললেন, "সুরা জীন।"

এতদিন সেকুলার পদ্ধতিতে মৃত মানুষের আত্মাকে টানাহেঁচড়া করার অভিজ্ঞতা ছিল, আজকে জীন আনা এবং তাকে দূর করার ধর্মীয় পদ্ধতিটাও শেখা হয়ে গেল!

পরদিন সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে খবরটা চাউর হয়ে গেছে। খবর অনেক ডালপালা নিয়ে ছড়ায়, এখানেও নিশ্চয়ই তাই হয়েছিল। কারণ দেখতে পেলাম আমাকে দেখেই সবাই সভয়ে সরে যাচ্ছে। ইমাম সাহেব যদিও আমাকে এই ধরনের কাজকর্ম থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন কিন্তু সপ্তাহখানেকের মাঝে আমি আবার এই কাজে নেমে গেলাম। মিডিয়াম হিসেবে এবারে আমার হাতে ফিরোজ—সে তারেক ভাই থেকেও সরেস। আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজটা যত ভয়ংকরই হোক একজন মিডিয়ামকে বললেই সে ভূতপ্রেত জীন নিজের কাঁধে নিয়ে আসতে প্রস্তুত। দ্বিতীয়বারের ঘটনাটি প্রথমবার থেকেও ভয়ংকর ছিল, যারা সেখানে ছিল তারা এখনো সেটি বলাবলি করে—আমি আর বলছি না!

মৃত আত্মা কিংবা জীন আনার এই ব্যাপারটি আসলে কী আমি এখনো জানি না। যতদিন একটা ছোট শিশির ভেতরে ভূত বা জীনকে ভরে ফেলে হাই ভোল্টেজ দিয়ে ডিসচার্জ করিয়ে তার স্পেকট্রাম দেখে এটা কী কী মৌল দিয়ে তৈরি বের করার সুযোগ না পাচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি এটা এক ধরনের স্বেচ্ছাসম্মোহন। কিংবা কে জানে হয়তো বহুদিন পরে কোথাও বন্ধু ফিরোজের সাথে দেখা হবে আর সে বলবে, মনে আছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমি তোমাদের কেমন বোকা বানিয়েছিলাম, তোমরা একবারও ধরতে পার নি! হা হা হা!

ফার্নিচার

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ ঠিক করেছে বিয়ে করবে। অন্য পরিবারের একটা মেয়ে আমাদের পরিবারে আসবে, এসে দেখবে বাসায় কিছু নেই, রাত হলে মশারি টানিয়ে সবাই ফ্লোরে ঘুমিয়ে যায় বিষয়টা নিয়ে তাকে খানিকটা চিন্তিত মনে হল। কীভাবে কীভাবে কিছু টাকা যোগাড় করে একদিন বিকালে আমাকে বলল, "চল, বাসার জন্যে একটা দুইটা ফার্নিচার কিনে আনি।"

আমরা নিউমার্কেট এলাকায় গিয়েছি। খুঁজে খুঁজে ফার্নিচারের দোকানে গিয়ে ফার্নিচারের দাম দেখে একেবারে আক্কেল গুড়ুম। কাঠের ফার্নিচারের যে এত দাম হতে পারে সেটা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করি নি! দাম শুনে মনে হল যে কাঠ নয়, সব ফার্নিচার বুঝি সোনা দিয়ে বানিয়েছে। কয়েকটা ফার্নিচারের দোকানে হাঁটাহাঁটি করেই আমরা বুঝে গেলাম যে আমাদের পক্ষে ফার্নিচার কেনা দূরে থাকুক, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখারই ক্ষমতা নেই। বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ একটু বিমর্ষ হয়ে গেল।

আমি বললাম, "এক কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"চল কিছু কাঠ কিনে নিয়ে যাই। তার সাথে করাত হাতুড়ি বাটাল এবং র‍্যাদ। নিজেরা ফার্নিচার বানিয়ে নেব।"

"পারবি?"

"না পারার কী আছে?" ঠিক কী কারণ জানি না কখনোই কোনো কাজকে

আমার কঠিন মনে হয় না। আমি জোর দিয়ে বললাম, "ভালো একটা ডিজাইন দেখে ফার্নিচার বানিয়ে নেব।"

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের আইডিয়াটা পছন্দ হল। হিসেব করে দেখা গেল যত টাকা নিয়ে এসেছি সেটা দিয়ে করাত, হাতুড়ি, বাটাল, র‍্যাদ আর কিছু কাঠ কিনে নেওয়া সম্ভব।

কাজেই সন্ধেবেলা আমরা দুই ভাই রিকশা করে কিছু কাঠের তক্তা তার সাথে করাত, হাতুড়ি বাটাল এবং র‍্যাদ নিয়ে হাজির হলাম। বলা বাহুল্য বাসার অন্যান্য লোকজন ফার্নিচার কিনে না এনে ফার্নিচার তৈরির কাঁচামাল কিনে আনা দেখে এমন কিছু অবাক হল না।

সন্ধেবেলা সবার সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হল কী কী ফার্নিচার তৈরি করা যায়। একজন বলল সোফা সেট, একজন বলল ডাইনিং সেট। বড় বোন বলল তার বেশি কিছু চাই না হারমোনিয়ামটা রাখার জন্যে একটা বাক্স তৈরি করে দিলেই হবে। আমরা বললাম "তথাস্তু!"

রাত্রিবেলা খেয়ে ছাদে ইলেকট্রিক লাইট লাগিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। কাঠমিস্ত্রিদের কাজ করতে দেখেছি, করাত দিয়ে কী সুন্দর ঘ্যাচঘ্যাচ করে কাঠ কেটে ফেলে, এই কাজটার মাঝে কোনো পরিশ্রম আছে সেটা ধারণাও করি নি। কিন্তু কাঠগুলো কাটতে গিয়েই আমাদের কালো ঘাম ছুটে গেল, খুব অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম কাঠ কাটা খুব পরিশ্রমের কাজ। কাজেই প্রথমে কোন ফার্নিচার বানানো হবে সেটা একটু পরিবর্তন করতে হল, ঠিক করা হল সোফা সেট কিংবা ডাইনিং টেবিল তৈরি না করে প্রথমে একটা সহজ জিনিস তৈরি করা হবে। সেটা হচ্ছে বুক শেলফ।

কাগজে ডিজাইন করে অনেক কষ্ট করে কাঠ কেটেছি। এখন র‍্যাদ দিয়ে সেগুলো পালিশ করার কথা। সবসময়েই দেখে এসেছি র‍্যাদ চালানোর সময় কাঠের পাতলা ছিলকে বের হয়ে আসে, ভারি সুন্দর একটা দৃশ্য। মহা উৎসাহে র‍্যাদ চালিয়ে কাঠ পালিশ করে যাচ্ছি এবং প্রতি ঘষাতে একটা করে ছিলকে বের হয়ে আসছে, সত্যি সত্যি সুন্দর একটা দৃশ্য—তবে ভারি পরিশ্রম। তক্তার এক পাশ পালিশ করতেই কালো ঘাম বের হয়ে গেল। ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ তার ফার্নিচার বানানোর প্রজেক্টে ইস্তফা দিয়ে নিচে চলে গেল।

আমি হাল ছেড়ে দিলাম না। আমার সমবয়সী এক মামাকে নিয়ে প্রায় সারারাত পরিশ্রম করে কাঠের তক্তাগুলো পালিশ করে ফেললাম।

পরদিন উঠে দেখি পালিশ করা তক্তাগুলো বাঁকা হয়ে আছে। কাঠমিস্ত্রি না হওয়ার কারণে কাঠ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই, সেগুলো সম্ভবত ভেজা ছিল এবং যতই শুকাতে লাগল ততই বাঁকা হতে লাগল। প্রতিদিন আমরা পালিশ করে সোজা করে রাখি, ভোরবেলা আবিষ্কার করি সেটা বাঁকা হয়ে আছে! শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে সেই বাঁকা তক্তাগুলোই পেরেক দিয়ে পিটিয়ে একটার সাথে আরেকটা লাগিয়ে বুক শেলফটাকে দাঁড়া করানো হল। কী রং দেওয়া হবে সেটা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে কুচকুচে কালো রং করে ফেলা হল। রং শুকিয়ে গেলে সেটাকে ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখা হল। বই দিয়ে সাজিয়ে রাখার পর সেটাকে রীতিমতো সত্যিকার শেলফের মতো দেখাতে লাগল।

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের বিয়ের পর যখন আমাদের ভাবি আমাদের বাসায় এসেছিল তখন অনেক পরিশ্রম করে তৈরি করা এই বুক শেলফটি ছাড়া নূতন কোনো ফার্নিচার আসে নি। ভাবি খুব অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছিল কিন্তু আমাদের এই নেহায়েত সাদামাটা অবস্থায় মানিয়ে নিতে তার কোনোই সমস্যা হয় নি।

আমাদের বাসায় কমবয়সী একটি নূতন বউ ঘুরে বেড়াচ্ছে—কী চমৎকার একটা সময়ই যে ছিল!

কিন্তু কেন?

বাংলাদেশ টেলিভিশনে বেলাল বেগ নামে একজন প্রযোজক ছিলেন, তিনি খুব উৎসাহী মানুষ—ঠিক করলেন টেলিভিশনে বিজ্ঞানের ওপর একটা প্রোগ্রাম করবেন। কীভাবে কীভাবে সেখানে জানি আমরা কয়েকজন যুক্ত হয়ে গেলাম। বিজ্ঞানের এই অনুষ্ঠানটা কীভাবে করা যায় সেটা নিয়ে প্রথমে দুই-একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল। যেমন : ছোট দল পিকনিক করতে গিয়ে হারিয়ে গেছে; খুব শীত আগুন জ্বালাতে হবে, পুরোনো বাল্বে পানি ভরে সেটা দিয়ে সূর্যের আলোকে ফোকাস করে আগুন ধরিয়ে ফেলল—আমি এরকম জটিল একটা কাহিনী লিখে আনলাম। সেটাকে অভিনয় করে দেখানোর জন্যে বাচ্চাকাচ্চা ধরে আনা হল, সেট তৈরি করতে হল। অভিনয়ের সময় বাচ্চারা পার্ট ভুলে যায়, মাঝে মাঝে তাদের খিদে পেয়ে যায় তখন নিজেরা নিজেরা ঝগড়াঝাঁটি করে। সব মিলিয়ে একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা। কিছুদিন চেষ্টাচরিত্র করে বেলাল বেগ পুরো অনুষ্ঠানটিকে সহজ করে ফেললেন। এই অনুষ্ঠানে ক্যামেরার সামনে আমি এবং আমাদের ক্লাসের সহপাঠিনী ফ্লোরা বিজ্ঞানসংক্রান্ত কিছু কথাবার্তা বলব। অনুষ্ঠানটার নাম দেওয়া হল 'কিন্তু কেন?' নামের সঙ্গে মিল রেখে অনুষ্ঠানের শুরুতে কয়েকটা বিচিত্র বিষয়ের কথা বলা হত, পরে অনুষ্ঠানের শেষে সেটা ব্যাখ্যা করা হত। যেমন একটা গ্রেনেডের ছবি দেখিয়ে বলা হল এটা আসলে একটা পারমাণবিক বোমা! পরে ব্যাখ্যা করার সময় বলা হল গ্রেনেডের বিস্ফোরক কাজ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। রসায়নের সব বিক্রিয়া হয় পরমাণু দিয়ে। কাজেই সঠিক অর্থে এই ধরনের বোমার নামই

হওয়া উচিত ছিল পারমাণবিক বোমা! পারমাণবিক বোমা বলতে আসলে আমরা যে ধরনের বোমা বুঝিয়ে থাকি সেটার সঠিক নাম আসলে নিউক্লিয়ার বোমা—ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞানের কোনো কিছু বোঝানোর জন্য যদি কখনো কোনো ছোটখাটো বিজ্ঞানের পরীক্ষা দেখানোর প্রয়োজন হত আমরা সেটাও দেখিয়ে ফেলতাম। মনে আছে এলকোহলে গাছের পাতাকে সিদ্ধ করতে গিয়ে একবার আমার হাতে আগুন ধরে গিয়েছিল! যাদের হাতে কখনো আগুন ধরে নি তারা বিষয়টা বুঝতে পারবে না—পুরো হাত মশালের মতো জ্বলছে এবং আমি আগুনটা নেভানোর জন্য ছোটাছুটি করছি—আগুন নিভছে না! শেষ পর্যন্ত যখন আগুন নিভেছে তখন আবিষ্কার করলাম হাতের দুই চারটা লোম পুড়ে একটু বোটকা গন্ধ তৈরি হওয়া ছাড়া আর কোনো সমস্যা হয় নি।

বাংলাদেশে তখন একটাই টেলিভিশন চ্যানেল এবং সেটা সাদাকালো। দেশে তখন যে দু–চারজন মানুষের টেলিভিশন ছিল তাদের সবাইকেই বিটিভির এই চ্যানেল দেখতে হত। আমাদের নিজের বাসায় টেলিভিশন নেই, নিজের অনুষ্ঠান দেখারও খুব বাড়াবাড়ি শখ নেই তাই সেই অনুষ্ঠান খুব বেশি দেখা হয় নাই। তবে দীর্ঘদিন আমরা এটা চালিয়ে গেছি। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার রেকর্ডিং হবে তাই কী করা হবে কী বলা হবে সেটা ঠিক করার জন্য আমাকে মাথা খাটিয়ে যেতে হত। তখন যদি ইন্টারনেট থাকত তাহলে কী সুবিধাই না হত।

টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠানটিতে আমার একটা বড় সুবিধে হয়েছিল, আমার নিয়মিত অর্থোপার্জনের একটা ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম নিজের খরচ নিজেই চালিয়ে নিয়েছি, বেশ সম্মানজনক উপায়েই। প্রাইভেট টিউশনির মতো অসম্মানের কাজ করতে হয় নি।

পিএইচ. ডি. করতে আমেরিকা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি এই অনুষ্ঠান করে গিয়েছি বড় কোনো সমস্যা হয় নি। একমাত্র যে সমস্যার কথা মনে করতে পারি সেটা একটু অন্যরকম। জামা–কাপড় নিয়ে আমার কখনোই খুব আগ্রহ ছিল না এবং একজন মানুষের একটা শার্ট এবং একটা প্যান্টের বেশি যে থাকতে হয় আমি সেটাও জানতাম না। কাজেই আমার শার্ট ছিল একটি এবং সেই একটি

শার্ট পরেই আমি টেলিভিশনে দিনের পর দিন অনুষ্ঠান করে যাচ্ছি—আমার বন্ধুবান্ধব আপত্তি করল।

না, আমি তখন নূতন শার্ট কিনি নি, অন্যভাবে সমস্যার সমাধান করেছি। ঠিক আমার সাইজের একজন বন্ধু ছিল, তার শার্টের কোনো অভাব ছিল না। আমার যেদিন অনুষ্ঠান রেকর্ড করতে হত আমি ফজলুল হক হলে তার রুমে এসে বলতাম, "পাশা, ভালো দেখে একটা শার্ট দাও দেখি।"

সে তার শার্টগুলো বের করে দিত—আমি বেছে বেছে একটা শার্ট নিয়ে সেই শার্ট পরে অনুষ্ঠান করতে যেতাম।

জটিল সমস্যার কী সহজ সমাধান!

পাহাড় এবং অরণ্য

সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার তারিখ দিয়েছে তাই সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছি। সাবসিডিয়ারি এমন একটা বিষয় যেটা কেউ পড়তে চায় না। মূল মার্কশিটে এর মার্কস যোগ হয় না তাই কোনোভাবে টেনেটুনে পাস করতে পারলেই সবাই খুশি। সারাবছর বই খুলেও দেখি নি তাই পরীক্ষার আগে পড়াশোনার খুব চাপ।

ঠিক এরকম সময় আমাদের পরীক্ষা পিছিয়ে গেল। পড়াশোনার এরকম চাপ থেকে হঠাৎ পুরোপুরি চাপশূন্য হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগতে থাকে। আমি আমার বন্ধুদের বললাম, "চল, কোনো জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।"

"কোথায়?"

আমি বললাম, "বান্দরবানে সাঙ্গু নামে একটা নদী আছে সেই নদী ধরে পাহাড়ের ভেতরে গভীর অরণ্যে চলে যাওয়া যাবে। সেখানে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সারা পৃথিবীতে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

আমার বন্ধুরা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, "আমি জানি।"

আমি আসলেই জানি এবং আমি সেটা জানি আমার বাবার কাছ থেকে। আমরা যখন ছোট, সাত আট বছর বয়স, তখন আমার বাবা বান্দরবান বদলি হয়েছিলেন। তখন প্রায়ই আরাকান থেকে ডাকাতেরা ডাকাতি করতে আসত।

বাবা পুলিশে চাকরি করতেন তাই সেখানে তদন্ত করতে যেতে হত। সাঙ্গু নদীতে নৌকা করে দীর্ঘদিনের জন্যে পাহাড় আর অরণ্যের মাঝে চলে যেতেন। ফিরে এসে সেই এলাকার গল্প করতেন, পাহাড় আর অরণ্যের মাঝে চমৎকার ভাবে মিশে যাওয়া আদিবাসী মানুষের গল্প। আমার বাবা খুব ভালো লিখতে পারতেন, সেই এলাকা নিয়ে তার কিছু পাণ্ডুলিপি ছিল, আমি সেগুলো পড়েছি। একাত্তরে যখন আমাদের বাসা লুট করে নেওয়া হয় তখন এই পাণ্ডুলিপিগুলো হারিয়ে যায়। বাবার সেই লেখালেখি থেকে আমি সেই এলাকার সৌন্দর্যের কথা জেনেছি।

আমার কথায় আরো দুজন রাজি হল, একজন আমার রুমমেট খাজা অন্যজন আধা তাত্ত্বিক আধা দার্শনিক রুহুল আমীন। আমরা দেরি না করে সাথে সাথেই রওনা দিয়ে দিলাম।

কোথাও ভ্রমণ করার জন্য তিন জন একটা ভালো সংখ্যা। দুজনে গেলে একজনের নার্ভের উপর অন্যজনের চড়াও হবার সম্ভাবনা থাকে, তৃতীয়জন থাকলে সেটার নিবৃত্ত হবার একটা সুযোগ হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়াও সহজ হয়, দুজন মিলে তৃতীয়জনকে রাজি করানো যায়। আমরা বান্দরবানের সেই দুর্গম এলাকায় যাবার জন্য বের হলেও অন্য দুজনের কারণে পরিকল্পনার একটু পরিবর্তন করতে হল। তারা আগে কখনো সমুদ্র দেখে নি তাই প্রথমে একটু কক্সবাজার যেতে চায়। তার উপর রাঙ্গামাটির এত গল্প শুনেছে সেটা একটু না দেখলে কেমন করে হয়?

কাজেই প্রথমে কক্সবাজার তারপর রাঙামাটি ঘুরে বেড়িয়ে আমরা বান্দরবান রওনা দিলাম। পাহাড়ি রাস্তা, যানবাহন বলতে একটা গাড়ি যেটা কোনো এক সময়ে জিপ ছিল বলে অনুমান করা যায়! এখন তার ভেতরে এবং ছাদে মিলিয়ে প্রায় জনা ত্রিশেক মানুষ বসতে পারে। শুধু মানুষ নয় নানারকম বোঁচকা বুঁচকি মালপত্র নিয়ে সেটি যখন রওনা দিল তখন সেটি আদৌ নড়তে পারবে বলে আমার মনে হয় নি! আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে সেটি চলতে শুরু করল। আমরা ছাদে পা ঝুলিয়ে বসেছি এবং সেই গাড়িটি নানারকম কাতর শব্দ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। ধুঁকতে ধুঁকতে একটি পাহাড়ের উপর উঠে গাড়িটার দম ফুরিয়ে গেল বলে মনে হল, একজন তখন বালতি নিয়ে ছুটে গেল

পানি আনতে! রেডিয়টরে পানি ঢেলে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করে আবার সেই গাড়ি ধুঁকতে ধুঁকতে রওনা দিল। আমরা ছাদে বসে চারিদিকে দেখছি। ঢাকা শহরে থাকি রাস্তাঘাট রিকশা বাস দেখে দেখে চোখ পচে গেছে হঠাৎ করে পাহাড় অরণ্য আর তার মাঝে আদিবাসী মানুষ দেখে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম।

বান্দরবানে পৌঁছে একটু মন খারাপ হল—আমার শৈশবের স্মৃতির সাথে মেলে না। তখন সেটি ছিল ছবির মতো একটা শহর, এখন সেটা কেমন জানি ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে। দোকানপাট মানুষের ভিড় হইচই সব মিলিয়ে সেই ছবি ছবি ভাবটা আর নেই। আমরা প্রথমে একটু ঘুরে বেড়ালাম, যে স্কুলে পড়েছি যে বাসায় থেকেছি সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম, খুঁজে পাবার পরও কেমন জানি অচেনা মনে হয়। শহরটা দেখে আমরা গেলাম নদীতীরে, নদীর ওপারে ছিল পাহাড় যেখানে আক্ষরিক অর্থে থাকত হাজার হাজার বানর। নদীর এপারে বসে ওপারে বানরের বাঁদরামো দেখা ছিল আমাদের সবচেয়ে মজার অভিজ্ঞতা। বাঁদরামো শব্দটা বাংলা ভাষায় কেমন করে এসেছে সেটা আমি শৈশবে এখান থেকে শিখেছিলাম।

নদীর ঘাটে অনেক নৌকা বাঁধা রয়েছে, আমরা তাদের কাছে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যটা খুলে বললাম। এই নদী ধরে গভীরে যেতে চাই। আমরা এই নদীতেই নৌকায় থাকব, নৌকায় খাব নৌকায় ঘুমাব। মাঝিরা নিজেদের মাঝে কথা বলে আমাদের জন্য একটা নৌকা ঠিক করে দিল। নৌকার মাঝির নাম মুসলিম। আমরা মুসলিম মাঝিকে কিছু টাকা-পয়সা দিলাম বাজার থেকে আগামী কয়েকদিনের রসদ কিনে আনার জন্য, তারপর আমরা নৌকায় পা ঝুলিয়ে বসলাম। আমাদের মনে ফুরফুরে এক ধরনের আনন্দ।

পড়ন্ত বিকেলে আমরা রওনা দিয়েছি। আমার দুই সহভ্রমণকারী খাজা এবং রুহুল খুব সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বলেছিলাম এখানে তারা দেখবে অসাধারণ নৈসর্গিক সৌন্দর্য। এই মুহূর্তে সেটা অনুপস্থিত, মফস্বলের বাজারের মতো একটা দৃশ্য। মাঝি মুসলিম লগি ঠেলে নৌকাটাকে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁকটা ঘুরতেই হঠাৎ করে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম। পরিষ্কার মনে হল আমরা বুঝি পৃথিবী ফেলে স্বর্গে পা দিয়েছি। পাহাড়ি নদী পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে গেছে। দুই পাশে পাহাড়, গাছ লতাপাতায় ঢাকা, নদীর উপর ঝুঁকে

পড়েছে। পাথরে পানির ধারা আঘাত করে একটা মধুর শব্দ করছে। টলটলে স্বচ্ছ পানি, আদিবাসী তরুণীরা সেই পানিতে নাইতে এসেছে। আমি রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইলাম। আমার বিশ্বাস হয় না, আমি কি আমার জীবনে কখনো এর চাইতে সুন্দর একটি জায়গা দেখতে পারব?

আমরা সেখানে পাঁচ-ছয় দিন ছিলাম। দিনের বেলা মাঝি মুসলিম লগি দিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে যেত। যখন খিদে পেত তখন নৌকাটা থামিয়ে তার ছোট চুলোয় রান্না চাপিয়ে দিত। খাবারের আয়োজন খুবই সাধারণ, দরিদ্র মাঝি মুসলিম জানেই না যে ভাত এবং ডাল ছাড়া কিছু খাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ডালের মাঝে একটা ডিম ভেঙে দেয়, সেটা খেতে মনে হয় অমৃত। রাত্রিবেলা কোনো একটা গ্রামের কাছাকাছি অন্য অনেক নৌকার সাথে নৌকা বেঁধে ঘুমানো হত—পরিষ্কার করে মাঝি মুসলিম কখনো আমাদের বলে নি কিন্তু আমরা আঁচ করতে পারছিলাম যে রাত-বিরেতে ডাকাতের হামলা এমন কিছু বিচিত্র ঘটনা নয়। নদীতে নৌকা যাচ্ছে আসছে কিন্তু তার আরোহীরা সবসময়েই স্থানীয় সাধারণ মানুষ, আদিবাসী খেটে খাওয়া মানুষ। চশমা চোখে শার্ট-প্যান্ট পরা তিন জন ইউনিভার্সিটির ছাত্রকে সবাই খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখতেই পারে!

আমাদের খুব চমৎকার কিছু সময় কেটেছিল সেখানে। রাত্রিবেলা নৌকার পাটাতনে তিনজন গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতাম। হাড়কাঁপানো শীত, শত চেষ্টাতেও শরীর গরম করা যায় না। নদীর পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, দুই পাশে পাহাড়ে বুনো পশুর ডাক—সব মিলিয়ে একটা রহস্যের মতো মনে হত।

একদিন রাত্রে হঠাৎ একটা অসাধারণ দৃশ্য চোখে পড়ল। চারপাশের পাহাড়ে যেদিকেই তাকাই মশাল হাতে সারি বেঁধে নারী-পুরুষ গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম কাছাকাছি কোথাও একটা পাহাড়ি উৎসব। এলাকার সব আদিবাসী মানুষ সেই উৎসবে যাচ্ছে। আমাদের উৎসবটা দেখার শখ হলো, মাঝি মুসলিম তখন আমাদের একটা দলে ভিড়িয়ে দিল। অন্ধকার রাতে পাহাড়ের পথ ধরে আদিবাসী নারী-পুরুষ মশাল হাতে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে, সে ভারি সুন্দর একটা দৃশ্য।

মূল উৎসব এলাকায় নাচ-গান হচ্ছে এবং স্থানে স্থানে জুয়ার আসর। ছোট ছোট বাচ্চারাও দেখি মুখে বাঁশের তৈরি এক ধরনের পাইপ লাগিয়ে ধুমিয়ে ধূমপান করছে। বাড়িতে চোলাই করা মদও আছে, আমাদের এক দুইজন একটু সাধাসাধিও করল, খাই না জেনে আর কেউ জোর করল না। নাচের আসরগুলো খুব সুন্দর, দূর দূর এলাকা থেকে নাচের মেয়েরা এসেছে, কী ফুটফুটে মায়াকাড়া তাদের চেহারা!

আমরা ভেবেছিলাম রাতটা ওখানে কাটিয়ে দেব কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক পরেই টের পেলাম শীতে জমে যাচ্ছি! পাহাড়ি ঠাণ্ডায় আমরা একেবারে কাবু হয়ে গেছি। এখন নদীতীরে আমাদের নৌকার মাঝি মুসলিমের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাব কেমন করে? আমাদের মতো শহুরে অপদার্থদের জন্যে পাহাড়ি মানুষদের এক ধরনের মমতা আছে। তারা বাঁশ দিয়ে আমাদের জন্য কয়েকটা মশাল তৈরি করে একটা খালের পাশে নিয়ে বলল এই খালের ধার দিয়ে আমরা যদি হেঁটে যাই নদীতীরে পৌঁছে যাব। কোনোভাবে যেন খাল থেকে সরে না যাই। মানুষগুলোকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা সেই মশাল নিয়ে রওনা দিয়েছি।

নির্জন একটা পাহাড়ি খালের কিনারা দিয়ে আমরা তিন জন হেঁটে যাচ্ছি। হাতে মশাল—সেই মশালের আলো আসলে দূরের অন্ধকারকে আরো জমাট করে তোলে! আশপাশে কোনো জনমানব নেই, কান পাতলে হয়তো কোনো বুনো পশুর নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাবে! ছমছমে গভীর রাত, কনকনে শীত, কোথাও কোথাও ঘন কুয়াশায় ঢাকা। সেই নির্জন খালের কিনারা দিয়ে অরণ্যের ভেতর দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে আমার বারবার মনে হচ্ছিল—আহা, আমার যদি এরকম একটা পাহাড়ে পাহাড়ি মানুষ হয়ে জন্ম হত তাহলে কী মজাই না হত!

পাহাড়ি মানুষ নাই যদি হতাম, একটা বেদে হিসেবেও কি জন্মানো যেত না? নৌকায় নৌকায় করে, এই দেশের নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াতাম!

একজন মানুষের জন্যে একটি জন্ম খুব কম, অনেকগুলো না হলে মনে হয় পুরো পৃথিবীটাকে দেখে শেষ করা যায় না।

বাস এবং সাইকেল

আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন অনেক সময়েই বাসায় থাকতাম। বাসা ছিল কলেজগেটে তাই বাসে করে ইউনিভার্সিটি যেতে হত। একদিন বাসে যাচ্ছি তখন আজিমপুরের কাছে চারটা ছোট ছোট বাচ্চা বাসে উঠল, তাদের সবার লম্বা কুর্তা এবং গোল টুপি, কাছাকাছি একটা এতিমখানার শিশু সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এতিমখানার বাচ্চাদের কাছে বাস ভাড়া থাকবে না সন্দেহে কন্ডাক্টর তখন তখনই বাচ্চাগুলোর কাছে ভাড়া চাইল এবং বাচ্চাগুলো উদাস দৃষ্টিতে না শোনার ভান করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আজকাল বাসের কন্ডাক্টরদের মেজাজ খানিকটা মধুর হয়েছে কি না জানি না কিন্তু সেই সময় তারা ছিল অত্যন্ত কাটখোট্টা মেজাজের। ভাড়া নেই টের পেয়ে মাথায় দুই চারটা চড়থাপ্পড় দিয়ে কন্ডাক্টর তখন তখনই বাস থামিয়ে বাচ্চাগুলোকে নামিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হল। বাসের ভাড়া খুব কম—চারটা বাচ্চার ভাড়া দিয়ে দেওয়া কোনো ব্যাপার নয় তাই আমি গলা নামিয়ে কন্ডাক্টরকে ডেকে ভাড়াটুকু দিয়ে দিলাম। বাচ্চাগুলো তখনো উদাস দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছে!

তখন বাসের মাঝে একটা নিউক্লিয়ার চেইন রি-একশান শুরু হল। একজন যাত্রী গলা উঁচিয়ে অন্য বাসযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "আপনারা বিষয়টা দেখলেন?"

অন্যরা বলল, "দেখেছি।"

প্রথমজন বলল, "এই চার জন তালেবুল আলেমের কাছে ভাড়া নাই বলে এই কন্ডাক্টর কী রকম ব্যবহার করল দেখেছেন?"

অন্যেরা গর্জন করে বলল, "দেখেছি!"

'কত বড় সাহস এই হারামজাদার।" আমাকে দেখিয়ে বলল, "এই কলেজের ছাত্রকে সেই ভাড়া দিতে হল। চারটা ছোট তালেবুল এলেম এতিম বাচ্চা কি বাসে ফ্রি যেতে পারে না।"

অন্যেরা বলল, "অবশ্যই পারে।"

একজন বলল, "শুয়োরের বাচ্চা কন্ডাক্টর।"

কয়েকজন প্রতিধ্বনি করল, "শুয়োরের বাচ্চা। ধর শালাকে—"

বাসের ভিতরে সবাই মিলে তখন কন্ডাক্টরকে ধোলাই দেওয়া শুরু করল। বাস কোনোমতে মেডিকেলে থেমেছে—আমি নেমে সোজা দৌড়! তখনই আবিষ্কার করেছি আমাদের বাঙালির মন বোঝা খুব মুশকিল—কখন যে সেটা তেতে উঠবে অনুমান করার কোনো উপায় নেই!

বাসে যাতায়াত করতে আমার ভালো লাগত না বলে সাইকেল রিকশার মেকানিকদের দোকান থেকে আমি একটা পুরোনো সাইকেল কিনেছিলাম। একেবারেই লক্করঝক্কর সাইকেল তবে খুব সস্তা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোন কোম্পানির সাইকেল?"

সাইকেল বিক্রেতা মেকানিককে খুব বিভ্রান্ত দেখা গেল মাথা চুলকে বলল, "হ্যান্ডেলটা হাম্বারের।"

আমি বুঝতে পারলাম বিভিন্ন সাইকেলের ধ্বংসাবশেষ থেকে নানারকম টুকরো যোগাড় করে এই সাইকেল তৈরি হয়েছে! হ্যান্ডেলটা এসেছে হাম্বার সাইকেল থেকে। আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, চললেই হল।

দেখা গেল সেটা খুব ভালো চলে না, সাইকেলে রওনা দিয়ে বেশিরভাগ সময় রাস্তার পাশে মেকানিকদের দিয়ে সাইকেল সারাতে হয়। শুধু তাই নয় প্যান্টের নিচের অংশ সাইকেলের ভেতর ঢুকে গিয়ে সেটা ছিবড়ের মতো করে ফেলে এবং আমি রাস্তার মাঝে ওলটপালট খেয়ে পড়ি! সাইকেলের যেখানেই হাত দেওয়া যায় সেখানেই যে চটচটে কালি থাকে আমি সেটাও তখন আবিষ্কার করলাম।

এরকম সময়ে রাশিয়া থেকে কিছু সাইকেলের চালান এল বাংলাদেশে। বাংলাদেশে তখন কিছুই পাওয়া যেত না। ঐ সাইকেলগুলোর চাহিদা মিগ ফাইটার প্লেনের কাছাকাছি—আমার পক্ষে সেটা কেনার কোনো উপায় নেই,

আমার দুলাভাই কীভাবে কীভাবে জানি সেটা আমাকে যোগাড় করে দিলেন। জোড়াতালি দেওয়া সাইকেল ফেলে দিয়ে আমি যখন সেই ঝকঝকে নূতন সাইকেলে উঠলাম আমার মনে হল সমস্ত পৃথিবী আমার পায়ের তলায়!

বহুদিন আমি সেই সাইকেলে চড়েছি, পুরো ঢাকা আমি চষে বেড়াতাম। সেই সাইকেলে একদিন যাচ্ছি দেখি রিকশা করে আহমদ ছফা যাচ্ছেন, আমাকে হাত তুলে থামালেন! আমি তার রিকশায় পা রেখে দাঁড়ালাম, আহমদ ছফা তার পকেট থেকে একটা এক টাকার নোট বের করে আমাকে দিলেন। বললেন "নাও।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন ছফা ভাই?"

আহমদ ছফা মুখ সুচালো করে বললেন, "তোমার একটা লেখা পড়েছি, খুব ভালো লেগেছে তাই দিলাম!"

লেখালেখি করে সেটা ছিল আমার প্রথম উপার্জন!

সাইকেলে করে যেতে যেতে মাঝে মাঝে আরো মজার ব্যাপার হত, হয়তো বিশাল একটা বাস ওভারটেক করে ছুটে যাচ্ছি তখন বাসও ছুটে আমার পাশে এসে দাঁড়াত, ড্রাইভার মাথা বের করে আমাকে ডাকত, "এই যে স্যার!"

আমি আবিষ্কার করতাম আমার পরিচিত একজন বাস ড্রাইভার। ডিপার্টমেন্টের সবাইকে নিয়ে পিকনিকে গিয়েছিলাম। মিরপুরের কোনো এক অন্ধগলি থেকে খুঁজে সেই ড্রাইভারকে বের করতে হয়েছিল, সেই থেকে পরিচয়! রাস্তার মাঝে ছুটন্ত অবস্থায় আমাকে দেখলেই বাস থামিয়ে আমার সাথে খোশগল্প করত। এক বাস বোঝাই যাত্রী ধৈর্য ধরে বসে আছে, বাসের ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বের করে আমার সাথে খোশগল্প করছে, আমি সাইকেলে বসে বাসে হেলান দিয়ে তার সাথে দেশ সমাজ আর রাজনীতি নিয়ে গল্প করছি দৃশ্যটা আমার কাছে কখনোই বিচিত্র মনে হত না!

সাইকেলটা হঠাৎ করে একদিন চুরি হয়ে গেল। উনিশ শ একাত্তর সালের পরে পার্থিব জিনিসের জন্য আমাদের কারো কোনো মায়া ছিল না, কিন্তু সাইকেলটা ছিল আমার একটা বন্ধুর মতো—তাই তার জন্য খুব কষ্ট হত। মনে হত যে চুরি করেছে সে আমার সাইকেলটাকে কষ্ট দিচ্ছে না তো? এখনো সেই সাইকেলের জন্য আমার কেমন জানি মন কেমন কেমন করে। আহা বেচারা, না জানি সে কেমন আছে!

অনার্স পরীক্ষা

ইউনিভার্সিটিতে আমাদের জীবন ছিল খুব আনন্দের। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে অনার্স পরীক্ষা। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার তিন বছর পর আমাদের সেই পরীক্ষা দিতে হত কাজেই টানা তিন বছর কাউকে লেখাপড়া করতে হত না। আমরা নিয়মিত ইউনিভার্সিটি এসেছি পছন্দের এক দুইটা ক্লাস করেছি বাকি সময়টা রাজা উজির মেরে, আড্ডা দিয়ে, নাটক করে বিভিন্ন রকম ফুর্তি করে কাটিয়েছি। তবে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টা আমার খুব পছন্দের বিষয় ছিল তাই ক্লাস না করলেও যতগুলো টেক্সট বই ছিল তার সব অঙ্কগুলো নিজে নিজে করে ফেলেছিলাম। আমার জীবনের সেটি ছিল আমার করা একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ আর শুধু এই কারণে পদার্থবিজ্ঞানে আমার ভিতটুকু ছিল পাকা।

দেখতে দেখতে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা চলে এসেছে এখানে শুধু ভিত পাকা হলে হয় না, পরীক্ষাতে ভালো করতে হয়। পরীক্ষাতে ভালো করার জন্য কোনো শর্টকাট উপায় নেই, তার জন্য পড়ালেখা করতে হয়। কাজেই আমরা শেষ তিন মাস পড়ালেখা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বেশিরভাগ ক্লাস করি নি বলে কোনো ক্লাসনোট নেই তার জন্য ক্লাসের মেয়েদের কাছে দ্বারস্থ হতে হল। তার কারণ দুটি, ছেলেদের থেকে মেয়েরা অনেক বেশি নিয়মিত ক্লাস করে এবং তাদের মন অনেক নরম। কাঁচুমাচু করে চাইলেই বড় কোনো লেকচার না দিয়ে খাতাটি দিয়ে দেয়। ফটোকপি মেশিন তখনো দেশে আসে নি বলে মাথা গুঁজে সেই খাতা কপি করতে জান বের হয়ে যেত। খাতা কপি করতে করতে এক জায়গায় আবিষ্কার করলাম ক্লাসনোটের এক জায়গায় ক্লাসের মেয়েটি লিখে

রেখেছে "আমি তখন সুইডেনে বেড়াতে গিয়েছি, সেখানে একটা মজার ঘটনা ঘটল।" ক্লাসে পড়াতে পড়াতে স্যার মাঝখানে ব্যক্তিগত জীবনের একটা গল্প করেছেন, আমাদের ক্লাসের সেই মেয়েটি চোখ বন্ধ করে সেটাও খাতায় লিখে রেখেছে!

যাই হোক ক্লাসনোট, বইপত্র খাতা কাগজ কলম সিগারেটের প্যাকেট এবং চা দিয়ে ঘর বোঝাই করে আমরা একদিন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে পরীক্ষার জন্য পড়তে শুরু করলাম। সেই পড়াশোনার কোনো তুলনা নেই। দিনের বেলাতেও দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের ভেতর অন্ধকারে লাইট জ্বালিয়ে পড়েছি। বাথরুমে যেতে হলে বের হই, দুপুরে খাবার জন্য বের হই, না হলে রাতের খাবারের জন্য বের হই। এ ছাড়া এক মুহূর্তের জন্য বিরতি নেই। পুরো তিন বছর যা যা পড়া হয়েছে তিন মাসে তার সবটুকু পড়ে মস্তিষ্কের ভেতর ঢুকিয়ে রাখা খুব সহজ ব্যাপার না। পড়তে পড়তে আমাদের ভেতরে এক ধরনের পজিটিভ ফিডব্যাক হতে শুরু করল! যত পড়ি তত পড়তে ইচ্ছে করে। একেকটা সাবজেক্ট শেষ করে আবার গোড়া থেকে শেষ করি, শেষ করে আবার শুরু করি। বেশিরভাগ ছাত্রই গত কয়েক বছরের প্রশ্ন গবেষণা করে সম্ভাব্য প্রশ্নের একটা তালিকা করেছে, আমি সেরকম কিছু করি নি। আমি একেবারে পুরো সিলেবাস পড়ছি! পুরো তিন মাস অন্ধকার ঘরের ভেতর মাথা গুঁজে পড়তে পড়তে আমাদের নিজেদের ভেতর একটা গুণগত পরিবর্তন হয়ে গেল। আমাদের গায়ের রং ইটের নিচে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মতো সাদা হয়ে গেল। প্রতিবেলা নিয়মমতো খাওয়াদাওয়া করার জন্য আমরা সবাই নাদুসনুদুস হয়ে উঠলাম।

একদিন অনার্স পরীক্ষা শুরু হল। আমার কোনো ঘড়ি নেই, জুনিয়র একটি ছাত্র তার ঘড়িটি ব্যবহার করতে দিল। আমি সেই ঘড়ি হাতে পরীক্ষা দিতে যাই। টানা পাঁচ ঘণ্টা পরীক্ষা দিয়ে ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে আসি। একদিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম আমাদের একজন সহপাঠিনী ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। খবর নিয়ে জানলাম পরীক্ষার রুটিন গোলমাল করে সে ভুল বিষয় পরীক্ষা দিতে চলে এসেছে! সে খুব ভালো ছাত্রী ছিল এই ভুলটুকু করে নিজের সর্বনাশ করে ফেলল। আমি পরীক্ষা দিতে দিতে তার দিকে তাকাই আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি—আহা বেচারি!

যেদিন পরীক্ষা শেষ হয়েছে সেদিন সবাই হলে আমার রুমে এসে হাজির হয়েছে। আমাদের সবার ধারণা তিন বছরের শেষে প্রায় গোটা দশেক বিষয়ের পুরো সিলেবাসের পুরো পরীক্ষা দেওয়ার অমানুষিক যন্ত্রণা শেষ করার পর নিশ্চয়ই এক ধরনের অলৌকিক আনন্দ হবে। আমরা সবাই সেই অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করার জন্য একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছি। ঠিক কীভাবে সেই আনন্দ শুরু হবে কেউ ধরতে পারছি না। সবাই চুপচাপ বসে আছি এবং প্রতিমহূর্তে আশা করছি হঠাৎ করে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের আনন্দটা শুরু হয়ে যাবে।

আনন্দ আর শুরু হয় না। আমরা হঠাৎ সূক্ষ্ম একটা নাকডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। আমাদের একজন আনন্দ শুরু হবার আগের মুহূর্তের সেই তীব্র উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে গেছে!

শিক্ষা সফর

ইউনিভার্সিটিতে আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন লেখাপড়া ছিল একটু পুরোনো ধাঁচের, তিন বছর পড়ার পর অনার্স পরীক্ষা শুরু হত। সেটা শেষ করার পর এক বছরের মাস্টার্স। আমরা যে বছর পাস করেছি সেই বছর থেকে মাস্টার্সের জন্য নূতন একটা বিভাগ খোলা হল সেটার নাম থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স। এটা মোটামুটি আধুনিক একটা বিভাগ, আমেরিকান কায়দায় দুটি সেমিস্টার। দুই সেমিস্টারে পাঁচটি পাঁচটি করে দশটি আধুনিক কোর্স। আমরা প্রথম দিকের দশ জন, ছয় জন ছেলে এবং চার জন মেয়ে খুব আগ্রহ নিয়ে এই আধুনিক বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলাম। বাকি ছেলেমেয়েরা পুরোনো বিভাগে রয়ে গেল। এক বিভাগের ছেলেমেয়েদের দুই ভাগে ভাগ করলে যা হয় তাই হল দুই ভাগের মাঝে একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। তারা দলে ভারি, পুরো ডিপার্টমেন্টই তাদের। আমাদের মাত্র এক জন শিক্ষক। নিজেদের ক্লাসরুম নেই, ল্যাব নেই, বসার জায়গা নেই। খানিকটা উদ্বাস্তুর মতো ঘুরে বেড়াই। পুরোনো বন্ধুবান্ধবেরা কখনো আমাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে, কখনো হিংসা করে।

আমার নিজের সমস্যা একটু অন্য রকম, সারা জীবন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এসেছি। যখনই সম্ভব হয়েছে পার্সেন্টেজ দিয়ে সটকে পড়েছি। বড় ক্লাসে কেউ টের পায় নি। ছোট ক্লাসে সেটা করা যায় না, হাতেগোনা দশ জন মাত্র ছাত্রছাত্রী, স্যারেরা সবার মুখ চেনেন, পালানোর উপায় নেই। আমি মুখ কালো করে ক্লাস করি। নূতন বিভাগ, স্যারদের খুব উৎসাহ, আমরা নিশ্বাস নেবার সুযোগ পাই না।

এর মাঝে নিশ্বাস নেবার একটু সময় হল। শীতের শুরুতে ঠিক করা হল আমরা শিক্ষা সফরে যাব। নামেই শিক্ষা সফর—এর মাঝে শিক্ষার কিছু নেই; কয়দিন সবাই মিলে কক্সবাজার রাঙামাটি এরকম মনোরম জায়গায় ঘুরে বেড়ানো। শিক্ষা সফরে যাবার জন্য সব বিভাগ ইউনিভার্সিটি থেকে টাকা পেয়েছে, সবার জন্য সমান টাকা এবং আমরা হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম অন্যান্য বিভাগে পঞ্চাশ–ষাট জন যে টাকা পেয়েছে আমাদের মাত্র দশ জনে সেই টাকা। আমরা মোটামুটি রাজার হালে ঘুরে বেড়াতে পারব।

তবে একটি সমস্যা এবং সেটি গুরুতর সমস্যা। আমরা সব ছেলেমেয়ে মিলে যেতে চাই। সাথে একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক না থাকলে মেয়েদের বাবা–মায়েরা যত বড় শিক্ষা সফরই হোক সেখানে যেতে দেবেন না। আমাদের এই নূতন থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স বিভাগের শিক্ষক মাত্র এক জন এবং তিনি তখন বিদেশে। আমাদের সাথে যাবার কেউ নেই! আমরা শুকনোমুখে কয়েকজন স্যারের কাছে আমাদের সাথে যাবার জন্য অনুনয় বিনয় করলাম এবং তাদের মাঝখান থেকে একজন স্যার রাজি হয়ে গেলেন! নূতন বিদেশ থেকে এসেছেন স্যার, অত্যন্ত আধুনিক মানুষ, এখনো বিয়ে থা করেন নি কিন্তু খুব দায়িত্বশীল, আমরা মহাখুশি। একদিন মহা হইচই করে আমরা আমাদের সেই স্যারকে নিয়ে রাঙামাটি কক্সবাজার বেড়াতে বের হলাম। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই কমলাপুর স্টেশনে হাজির হয়েছি, ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কেনা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে এক জন মেয়ে বাদ পড়েছে, অন্য তিন জনের বাবা–মা তাদের তুলে দিতে এসেছেন। বাবা–মায়েরা স্যারকে বললেন, "আপনি একটু এদের দেখে রাখবেন।"

স্যার বললেন, "অবশ্যই দেখে রাখব।"

বাবা–মায়েরা বললেন, "আজকালকার ছেলেদের কোনো বিশ্বাস নেই, সাথে আপনি যাচ্ছেন বলে এদের যেতে দিচ্ছি।"

স্যার বললেন, "আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। আমি আছি।"

আমরা ট্রেনে উঠলাম গার্ড হুইসেল দিল এবং আমাদের আনন্দভ্রমণ শুরু হল।

শুরুতেই একটা ছোট সমস্যা দেখা দিল, স্যার সদ্য বিদেশ থেকে এসেছেন কিছুতেই যেখানে খুশি সেখানে কিছু ফেলতে দেবেন না! কলা খাবার পর কলার

ছিলকে, ডাব খাবার পর ডাবের খোসা, বিস্কুট খাবার পর বিস্কুটের প্যাকেট ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে হবে। সমস্যা হচ্ছে কোথাও ময়লার ঝুড়ি নেই। তাই স্যার নিয়মমাফিক আমাদের হাতে বর্জ্য পদার্থ তুলে দিতে লাগলেন এবং ময়লার ঝুড়িতে ফেলে আসার ভান করে আমরা এদিক-সেদিক সেগুলো ছুড়ে ফেলতে লাগলাম।

প্রথম চট্টগ্রাম শহর, সেখান থেকে রাঙামাটি, আমরা মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি। স্যারের বাবা খুব বড় সরকারি কর্মকর্তা। আমাদের জন্যে সব ব্যবস্থা করে রাখছেন। কাজেই যেখানেই যাই সেখানে গাড়ি, ট্রলার, গেস্টহাউজ, খাবারদাবার সব রেডি থাকে, আমরা রাজার হালে থাকি। রাঙামাটিতে বিশাল হ্রদের টলটলে নীল পানি—সেখানে সাঁতার কেটে বালুবেলায় শুয়ে থাকি। স্যার ট্রলারের গলুইয়ে বসে কবিতা লেখেন, সব মিলিয়ে চমৎকার সময় কাটছে।

শিক্ষা সফরের বড় অংশটি রেখেছি কক্সবাজারের জন্য। তাই যেদিন রাতে কক্সবাজারে পৌঁছেছি আমাদের আনন্দ আর ধরে না। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে তখনই বের হয়ে গেলাম। ঝাউবনের একধরনের উদাসী বাতাসের শব্দ, সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। নির্জন বালুবেলা, জ্যোৎস্নার আলোতে রহস্যময় পরিবেশ—এক কথায় আমরা ব্যাকুল হয়ে গেলাম। আমাদের ভেতর একজন এর মাঝে গাঁজা খাবার অভ্যাস করেছে। সে গাঁজা টেনে আরো ব্যাকুল হয়ে গেল। এই চমৎকার সমুদ্রতটে আমরা পাঁচ-ছয় দিন কাটাব চিন্তা করেই আমাদের মন পুলকিত হতে থাকে।

আমাদের ফুর্তি দেখে খোদা মুচকি হাসলেন। পরদিন সকালে দেখলাম স্যার ব্যস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছেন, খুব গম্ভীর হয়ে কিছু টেলিফোন করে আমাদের সবাইকে ডাকলেন। আমরা চিন্তিতভাবে স্যারকে ঘিরে দাঁড়ালাম, স্যার বললেন,"একটা বড় সমস্যা হয়ে গেছে।"

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কী সমস্যা?"

"বলতে পারো এক ধরনের ইমার্জেন্সি।"

আমরা শুকনো গলায় বললাম, "কী ইমার্জেন্সি ?"

স্যার বললেন, "সেটা তোমাদের বলতে পারব না, কিন্তু আমাকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে।"

আমরা মাথায় হাত দিয়ে বললাম, "সর্বনাশ! তাহলে আমাদের শিক্ষা সফরের কী হবে ?"

স্যার বললেন, "আমি খুব দুঃখিত। আমাকে যেতেই হবে।"

"আপনি চলে গেলে আমরা থাকি কেমন করে? সঙ্গে মেয়েরা আছে।"

একজন বলল, "গার্জিয়ানরা আপনি আছেন বলে মেয়েদের আসতে দিয়েছে।"

স্যার বললেন, "আমাকে ছাড়া তোমরা থাকতে চাইলে থাক। কিন্তু আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।"

স্যার নিজের ব্যাগ গোছাতে শুরু করলেন। আমরা বিশাল লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেরা কথা বলতে থাকি। মেয়েদের একজন বলল, "আমরা বড় হয়েছি না ? স্যার ছাড়া থাকি, সমস্যা কোথায়?"

আমরা হাতে কিল দিয়ে বললাম, "সমস্যা কোথায় ?"

একজন একটু ইতস্তত করছিল তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলাম।

স্যার একটু পরেই প্লেন ধরে ঢাকা রওনা হয়ে গেলেন। আমরা শিক্ষা সফরের বাকি অংশ শেষ করার জন্যে থেকে গেলাম। এখন শিক্ষকবিহীন আমরা নয় জন ছেলেমেয়ে। স্যার থাকার সময় আনন্দ ফুর্তি একটু রয়েসয়ে করতে হত, এখন আমরা লাগামছাড়া ফুর্তি করতে শুরু করলাম। বালুর মাঝে গর্ত করে সারা শরীর পুঁতে রেখে শুধু মাথাটা বের করে রেখেছি। জিবে কামড় দিয়ে পড়ে থাকি। লোকজন বালুবেলায় একটা মুণ্ডু পড়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে। সমুদ্রের পানিতে লাফালাফি করার আনন্দ অন্যরকম। একজন চ্যাংদোলা শব্দটার অর্থ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করায় সবাই মিলে তাকে ধরে চ্যাংদোলা করে সমুদ্রের পানিতে ফেলে দিলাম। গভীর রাতে আমরা কাঁধে লাকড়ি আর খাবার নিয়ে বালুবেলায় চলে যেতাম, আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করে বেসুরো গলায় গান গাইতাম। কম বয়সে আনন্দ করার জন্য যা করার কথা তার কিছুই বাকি থাকল না।

শেষ পর্যন্ত কোনোরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই শিক্ষা সফর শেষ করে আমরা ফিরে আসতে শুরু করেছি। প্রথমে বাসে করে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে ঢাকায়। যতই ঢাকার কাছে আসছি আমাদের ভেতর ততই এক ধরনের দুশ্চিন্তা চেপে

বসছে। কমলাপুর স্টেশনে মেয়েদের বাবা–মায়েরা তাদের নিতে আসবেন, যখন দেখবেন স্যার নেই তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। কমবয়সী ছেলেমেয়েরা কোনো অভিভাবক ছাড়া কক্সবাজারে ঘুরে বেড়িয়েছে বাবা–মায়েরা সেটাকে মোটেও ভালো চোখে দেখবে না। মেয়ে তিন জনকে বিশেষ দুশ্চিন্তিত দেখা গেল—বাবা–মায়েরা তাদের বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবেন।

ট্রেন টঙ্গি এসে থেমেছে, আর কয়েক স্টেশন পরেই কমলাপুর। এমন সময় আমাদের বগীর দরজায় টুকটুক শব্দ। দরজা খুলতেই দেখি স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, "স্যার আপনি?"

স্যার মৃদু হাসলেন, বললেন, "কাউকে কিছু বলার দরকার নাই।"

আমরা বললাম, "বলব না স্যার।"

ট্রেন এসে কমলাপুর থামল। মেয়েদের নেবার জন্যে তাদের বাবা–মায়েরা এসেছেন। স্যার আমাদের সবাইকে নিয়ে ট্রেন থেকে নামলেন। বাবা–মায়েরা এগিয়ে এসে বললেন, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সবাইকে সুস্থ শরীরে ফিরিয়ে এনেছেন।"

স্যার কোনো কথা না বলে মৃদু হাসলেন। আরেকজন বললেন, "ছেলেমেয়েরা যা পাজি, নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে।"

স্যার এবারেও মৃদু হাসলেন।

"আপনার মতো এরকম দায়িত্বশীল লোক সঙ্গে ছিলেন বলে যেতে দিয়েছিলাম, তা না হলে কি যেতে দিই ?"

স্যার এবারেও আবার একটু মৃদু হাসলেন।

আমরাও মৃদু হাসলাম। আমাদের হাসি অবশ্য আরো অনেক বিস্তৃত হল।

কোর্ট ম্যারেজ

পিএইচ. ডি. করতে আমেরিকা যাবার দুদিন আগের ঘটনা। প্রথমবার দেশের বাইরে যাচ্ছি কবে আবার ফিরে আসব জানি না। বিষয়টা আসলে প্রায় মৃত্যুর মতো একটা ব্যাপার আমি সেটা তখনো জানি না। বিদায় নেবার জন্যে অনেকে আসছে যাচ্ছে তখন সন্ধেবেলা হঠাৎ করে রুহুল আমীন এসে হাজির। সেও আমেরিকা যাবে—আমার ইউনিভার্সিটির নাম ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন তারটা হচ্ছে ইয়েল। আমি যাবার আগে আগে ম্যাপ খুলে আবিষ্কার করেছি যে আমার ইউনিভার্সিটি আমেরিকার উত্তর-পূর্ব কোনার প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে। এখন সেই এলাকাটা চেনানোর জন্য বলা হয় যে মাইক্রোসফটের অফিস, তখন বলা হত বোয়িং প্লেনের কারখানা। আমি আর রুহুল একসাথে টিকেট করেছি, ঢাকা থেকে একই ফ্লাইটে রওনা দেব, লন্ডন গিয়ে আলাদা হয়ে যাব।

রুহুল আমীন দীর্ঘ সময় বসে রইল। যখন সবাই চলে গেল তখন আমাকে ফিসফিস করে বলল, "তোমার সাথে কথা আছে। অত্যন্ত গোপনীয় কথা।"

আমি তার গোপন কথা শোনার জন্যে তাকে নিয়ে ছাদে চলে গেলাম, রুহুল আমিন গলা নামিয়ে বলল, "কাল আমি কোর্ট ম্যারেজ করব, তোমাকে সাক্ষী থাকতে হবে।"

রুহুল আমিনের সাথে আমাদের আরেক সহপাঠিনী ইরানীর দীর্ঘদিন থেকে জানাশোনা। মাত্র কিছুদিন আগে আমরা টের পেয়েছি রুহুল আমিনের বাবার সেখানে ঘোর আপত্তি। তিনি ডাকসাঁইটে পুলিশ অফিসার ছেলের কাণ্ডকারখানায়

তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত এবং পারলে এখনই শুধু ইরানী নয় তার পরিবারকেই গ্রেপ্তার করে ফেলেন। রুহুল আমিন কী করবে বুঝতে পারছিল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঠিক করেছে যাবার আগে কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলবে। বিয়েতে দুজন সাক্ষী থাকতে হয়, রুহুল আমীন আমাদের এক বন্ধুকে রাজি করিয়েছে আরেকজন সাক্ষী হব আমি। রুহুল আমীন শুকনো গলায় বলল, "পুরো ব্যাপারটা কিন্তু গোপন রাখতে হবে। জানাজানি হলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

আমি অভয় দিলাম, বললাম, "তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কাকপক্ষী দূরে থাকুক মশামাছি পর্যন্ত জানবে না।"

পরের দিন বিকেলে আমরা একত্র হয়েছি। রুহুল আমীনের হাতে একটা ফাইল, সেখানে তার সার্টিফিকেট। বিয়ের বয়স হয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্য কাজে লাগতে পারে। শামসুন নাহার হল থেকে ইরানীও বের হয়ে এল। দুই রিকশা করে আমরা রওনা দিলাম। শাহীন স্কুলের কাছে একটা কাজী অফিস, সেখানে আমরা হাজির হয়েছি—বিয়ের বর বধূ এবং আমরা দুজন সাক্ষী।

কাজী ভদ্রলোক অত্যন্ত কুটিল চোখে এবং সন্দেহের ভঙ্গিতে আমাদের দেখতে লাগলেন। কাগজপত্রে দেখলেন তারপর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। বিয়ের নিয়ম অনুযায়ী আমি রুহুল আমীনের হাতে ইরানীকে তুলে দিলাম। ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্য আমরা চার জন একটা স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুললাম। তারপর একটা ফাস্টফুডের দোকানে গেলাম হ্যামবার্গার খেতে। সেটাই ছিল বিয়ের ভোজ।

বছরখানেক পর ইরানীকে রীতিমতো চোরাচালানী করে অত্যন্ত গোপনে আমেরিকা পাঠিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা কাউকে জানানো হয় নি। শেষ পর্যন্ত যখন জানাজানি হল তখন রুহুল আমীনের বাবা ডাকসাঁইটে পুলিশ অফিসার যা একটা কাণ্ড করলেন সেটা আর বলার মতো নয়। বিয়েতে সাক্ষী ছিলাম বলে আমার মায়েরও ভোগান্তি কম হয় নি।

আমেরিকা প্রবাসী রুহুল আমীন–ইরানীর ফুটফুটে দুটি মেয়ে আছে। রুহুল আমীনের বিয়েতে আমি মেয়ে পক্ষের অভিভাবক ছিলাম বলে আমি তাদের

ছেলে-মেয়ের ধর্মপিতা। শেষবার যখন দেখা হয়েছে তখন শুনেছি ছোট মেয়েটি তার বাবা-মাকে বলছে, "জাফর ইকবাল চাচা আমার ধর্মপিতা। তোমরা যদি আমাকে বেশি জ্বালাতন কর আমি কিন্তু চাচার সাথে চলে যাব।"

আমি আমার ধর্মকন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, "অবশ্যই! আমি আছি তোমার পাশে, দেখি কীভাবে তোমার বাবা-মা তোমাকে জ্বালাতন করে!"

গ্রাজুয়েট স্কুল

একদিন ডিপার্টমেন্টে গিয়েছি হঠাৎ করে শুনতে পেলাম আমেরিকা থেকে পদার্থবিজ্ঞানের দুজন প্রফেসর এসেছেন। তারা ছাত্রদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে। আমেরিকার বেশ অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি মিলে এই দুজন পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসরকে আমাদের এই উপমহাদেশে পাঠিয়েছে। তারা এই এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঘুরে ছাত্রদের পদার্থবিজ্ঞানের উপরে মৌখিক পরীক্ষা নেয়। পরীক্ষা নেবার পর তাঁদেরকে উপযুক্ত মনে করে তাদের নাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠিয়ে দেয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদেরকে তখন পিএইচ. ডি. করতে ড়াকে। এমনিতে পিএইচ. ডি. করার জন্য আমেরিকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুলে ভর্তি হতে হলে জান বের হয়ে যায়।

এটা মোটামুটি একটা সুযোগ কিন্তু সবাই সভয়ে সেই সুযোগ থেকে সরে দাঁড়াল। যাকেই জিজ্ঞাসা করি সেই আঁতকে উঠে বলে, "মাথা খারাপ? দেশের স্যারেরা ভাইভা নিলেই কালো ঘাম ছুটে যায়—আর আমেরিকান প্রফেসর!"

শেষ পর্যন্ত আমরা দুই-একজন ইন্টারভিউ দিতে রাজি হলাম। আমার যখন ডাক পড়েছে তখন সন্ধে হয়ে গেছে। একজন স্যারের রুমে পাহাড়ের মতো দুই জন প্রফেসর বসে আছেন—একজন মধ্যবয়স্ক অন্যজন রীতিমতো বুড়ো। আমাকে সামনে বসিয়ে প্রথম একটা কাগজে আমার নাম ঠিকানা লিখিয়ে নিলেন তারপর পদার্থবিজ্ঞানের ওপর প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি তাদের কোনো কথাই বুঝি না, মনে হয় শব্দগুলো গলার ভেতরে রেখে উচ্চারণ করে, মুখ ফুটে কথা বলতে চায় না। নেহায়েত কাগজকলম ছিল বলে রক্ষা, সেখানে সমস্যাগুলো

এঁকে দেখায় বলে অনুমান করতে পারি। প্রফেসর দুজনের ধৈর্য অসীম। আমার পিছনে ঘণ্টাখানেক লেগে রইল। সন্ধেবেলা আমাদের মশারা রক্ত খেতে বের হয়। এই দুজন মোটাতাজা আমেরিকানকে পেয়ে তাদের নিশ্চয়ই আনন্দের সীমা নেই। চারিদিক থেকে তাদের ছেঁকে ধরেছে। আমরা থাবা দিয়ে মশা মারি, এই প্রফেসররা পদার্থবিজ্ঞান খুব ভালো জানলেও মশা মারা জানেন না। দুই আঙুল দিয়ে উড়ন্ত মশাটাকে টিপে ধরার চেষ্টা করেন!"

বের হবার পর বন্ধুরা জানতে চাইছে ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে। আমি মাথা চুলকে বললাম, "সেটা তো বলতে পারছি না! মনে হয় প্রফেসররা জিজ্ঞাসা করছেন একটা, আমি বলেছি অন্য একটা!"

যাই হোক তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। আমাদের ক্লাসের ভালো ভালো ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকার নানা ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ করছে, ভর্তি হবার জন্যে লেখালেখি করছে। আমি কিছু করছি না। ভর্তির আবেদন করতেই অনেক টাকা লাগে, তারপর যাবার জন্য প্লেনের টিকেট কিনতে হবে। আমাকে বাজারে দশবার বিক্রি করলেও সেই টিকেট কেনার টাকা উঠবে না।

এরকম সময় আমেরিকার দুই ইউনিভার্সিটি থেকে আমার কাছে দুটি চিঠি এল। তারা লিখেছে, ভ্রাম্যমাণ প্রফেসররা তাদের কাছে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে সেটা দেখে তাদের ধারণা হয়েছে আমি পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচ. ডি. করার যোগ্যতা রাখি। আমি যদি তাদের সাথে যোগাযোগ করি তারা আমাকে নিয়ে নেবে!

দুটি চিঠির ভেতর একটা চিঠির প্যাডের কাগজটা সুন্দর, টাইপটাও ভালো কাজেই আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে হল এবং হঠাৎ একদিন একটা চিঠি এল আমাকে তারা গ্রাজুয়েট স্কুলে ভর্তি করেছে, খরচ চালানোর জন্য একটা এসিস্টেন্টশিপও দিয়েছে। ডলারকে টাকায় পরিবর্তন করে দেখি আমাদের দেশী টাকায় অনেক টাকা।

আমি সেই চিঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি । খুশি হব নাকি দুঃখ পাব বুঝতে পারছি না। তার কারণ প্লেনের ভাড়ার টাকা কোথা থেকে আসবে জানি না। কারো কাছ থেকে ধার করার মতো বড়লোক আত্মীয়স্বজনও নেই। এরকম সময় আমার কাছে জার্মানি থেকে একটা চিঠি এল। চিঠির ভেতরে একটা ব্যাংক

ড্রাফট। আমার রুমমেট এবং ছেলেবেলার বন্ধু ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কিছুদিন আগে জার্মানি গিয়েছে। আমার খবর পেয়ে সে প্লেনের ভাড়াটা পাঠিয়ে দিয়েছে। টাকাটা এমনি এমনি দেয় নি, একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছে, আমেরিকা যাবার সময় জার্মানি হয়ে যেতে হবে এবং অবশ্য অবশ্যই তার সাথে কমপক্ষে দশ দিন থেকে যেতে হবে!

এটি আমার জীবনের বৈশিষ্ট্য—কখনোই নিজে থেকে কিছু করতে হয় না। কীভাবে কীভাবে জানি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমি কোথায় যাব কী করব সব যেন আগে থেকে ছক কাটা আছে! পিএইচ. ডি. শেষ করার সাথে সাথে ক্যালটেক থেকে একজন প্রফেসর আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, "তুমি কি আসবে এখানে?" ক্যালটেক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি। আমি সাগ্রহে ক্যালটেকে পোস্টডক হিসেবে যোগ দিয়েছি। সেখানে জীবনের খুব আনন্দময় সময় কেটেছে। তখন বেল কমিউনিকেশনস রিসার্চ আমার সাথে যোগাযোগ করল, "তুমি কি আসবে?" আমি ভাবলাম মন্দ কী, দেশে যাবার আগে মোটা বেতনে চাকরি করতে কেমন লাগে দেখি! সেখানে যোগ দিলাম। বছর পাঁচেক পর দেশে আসব আসব করছি, একবার অবস্থাটা বোঝার জন্য দেশে এসেছি। তখন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বললেন, "তুমি কি আসবে এখানে?" আমি সাথে সাথে চলে এলাম। সেই থেকে দেশে আছি।

আমার ধারণা যারা অলস প্রকৃতির মানুষ, সৃষ্টিকর্তা মায়াবশত তাদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেন।

আমাকে যেমন দিয়েছেন!

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচ. ডি. করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

তাঁর স্ত্রী ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।